বিশ্বসেরা চিরায়ত সাহিত্য

এক দণ্ডিতের শেষ দিন

ভিক্টর হুগো

অনুবাদ • স্বপন চট্টোপাধ্যায়

BanglaBook.org

"মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শোনার আগ পর্যন্ত আমি নিশ্চিত যে আমার ফুসফুসে বাতাস প্রবেশ করছিল, হৃদপিণ্ড ধুকধুক করে চলছিল, আমার শরীর বহু মানুষের সমাগমে নির্দ্বিধায় দাড়িয়ে ছিল; আর তারপর, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তাদের আর আমার মাঝখানে একটা দেয়াল উঠে দাড়াল। কিছুই আর আগের মতো লাগছিল না।"

গভীর অনুভূতিময় উপন্যাসটিতে বন্দী ধারাবর্ণনাকারী মৃত্যুদণ্ডের প্রতীক্ষায়– সে অপেক্ষা করছে আর অপেক্ষা করছে। যদিও তার অপরাধ অনস্বীকার্য, তবু আসন্ন অবধারিত মৃত্যুর আশঙ্কায় তার ভেতরের মানবিকতা জেগে ওঠে।

ভিক্টর হুগোর প্রথম দিককার জ্ঞানগর্ভ লেখাগুলোতেও কালোত্তীর্ণ *লা মিজারেবল* উপন্যাসের মতো একই পাঠকপ্রিয়তা পাবার ক্ষমতা লুকিয়ে আছে। ফাঁসিকাষ্ঠের বরাবর বিরুদ্ধাচারণ করা লেখক ভিক্টর হুগো তার লেখা এবং বক্তব্যের মাধ্যমে বারবার চেয়েছেন যেন বিচারব্যবস্থায় সংযুক্ত মানুষদের মনে মানবিক অনুভূতি জাগে। এই কাহিনিটি লেখকের বিশ্বাসকে করেছে আরো দৃঢ় এবং মৃত্যুদণ্ড নিয়ে চলতি বিতর্কে যোগ করেছে নতুন মাত্রা।

ভিক্টর মারি হুগো ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮০২ সালে ফ্রান্সে জন্মগ্রহন করেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বিশাল সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তার সন্তান ছিলেন তিনি। একাধারে সাহিত্য এবং রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। ফ্রান্সে সাম্রাজ্য আইন থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া এবং সেই প্রক্রিয়ার নানান উত্থান-পতনে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্যারিসে বসবাসরত ভিক্টর হুগো তরুণ বয়সেই তার কবিতা, কল্পকাহিনি এবং নাটকের জন্য বিখ্যাত এবং কখনো কুখ্যাতও হয়েছিলেন। ১৮৪৫ সালে, তার বিখ্যাত গ্রন্থ *লা মিজারেবল* লেখার সময়, রাজা তাকে ফ্রান্সের উচ্চকক্ষের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেন। আইনসভার সর্বোচ্চ দলের সঙ্গে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়। তিনি সেখানে সবার জন্য বিনা খরচে লেখাপড়া, সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং মৃত্যুদণ্ডের বিলুপ্তির ব্যাপারে কাজ করা শুরু করেন। ১৮৪৮ সালে যখন রাজ্যে উন্নতির জোয়ার স্পষ্টভাবে কড়া নাড়ছিল, তিনি *লা মিজারেবল* লেখা বন্ধ করে রাজনীতিতে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ১৮৫১ সালে যখন দেশের প্রেসিডেন্ট নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন, হুগোর রাজনৈতিক চেতনার বিরোধিরা তাকে বৃটিশ চ্যানেলের একটি দ্বীপে নির্বাসনে বাধ্য করে। নির্বাসনে থেকেই ১৮৬০ সালে তিনি আবার *লা মিজারেবল* লেখার কাজে হাত দেন এবং পরের বছর উপন্যাসটি শেষ করেন। ১৮৭০ সালে সম্রাটের পতন হলে হুগো ফ্রান্সে ফেরত আসেন, যেখানে তাকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র হিসেবে বিপুলভাবে সম্মানিত করা হয়। ২২ মে ১৮৮৫ সালে ভিক্টর হুগোর মৃত্যুর পরে ফ্রান্সের রাস্তায় তার কফিন বয়ে নেবার সময়ে বিশ লাখ মানুষের ঢল নামে। সেদিন ফ্রান্সের জনগণ যতভাবে সম্মান জানানো সম্ভব, জানিয়ে তার শেষকৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

যে কোনোরকমের চরম শাস্তির বিরোধিতায় উপন্যাসের বক্তব্যটি আজকের দিনে মানবিকতায় ভরপুর যে কোনো মানুষের মুখের কথা হতে পারে।

–অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল

Le Dernier jour d'un condamné

(The Last Day of a Condemned Man)

Victor Hugo

বিশ্বসেরা চিরায়ত সাহিত্য

এক দণ্ডিতের শেষ দিন

মূল : ভিক্টর হুগো

অনুবাদ স্বপন চট্টোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সন্দেশ

সন্দেশ
ISBN-978-984-8088-89-0

এক দণ্ডিতের শেষ দিন

মূল : ভিক্টর হুগো

অনুবাদ : স্বপন চট্টোপাধ্যায়

Le Dernier jour d'un condamné by Victor Hugo
First published 1829
অনুবাদস্বত্ব © সন্দেশ ২০১৬

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

কোড ১২২৬

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, ১৩৮৩/৮/এইচ, নতুনবাগ, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : sandesh.publication@live.com
info@sandeshgroup.com
www.sandeshgroup.com

কম্পোজ সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

বিক্রয় কেন্দ্র সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

বাংলা ভাষার অনুবাদস্বত্ব বা সর্বস্বত্ব প্রকাশক সন্দেশ কর্তৃক সংরক্ষিত। বাংলা ভাষার কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

১৮০.০০ টাকা

উৎসর্গ

বাবী আর পায়েলকে

মুখবন্ধ

এমন কিছু লেখক আছেন যাঁদের সাহিত্যকর্ম তাঁদের নিজেদের সময় ও ভূখণ্ডের মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকলেও দেশকালের গণ্ডী কত সহজেই না ছাড়িয়ে যায়। প্রাক ফরাসি বিপ্লব যুগের ভূমিপুত্র ভিক্টর হুগোও তেমনি একজন লেখক। তাঁর নিজের জীবন বিস্তৃত হয়েছে এক শতকের গণতন্ত্র ও সুবিচার সম্পর্কীয় ন্যায় নীতির বিকাশকে ঘিরেই। তাঁর যুগের তিনি ছিলেন যুগপুরুষ। শুধু তাই নয়, আজ বুঝতে পারি যে তিনি আজ আমাদের এই কালেরও যুগপুরুষ। হয়তো তাই তিনি লিখতে পেরেছিলেন—'সামাজিক সমস্যার কোনো সীমারেখা হয় না। মানুষের ব্যথা বেদনার কাহিনী যা পৃথিবীকে বিষাক্ত করে দেয় তা মানচিত্রের লাল নীল রেখাচিত্রের মধ্যে চিহ্নিত করে রাখা যায় না।' তাই এটা কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র নয় যে লা মিজারেবলস্ এই বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও এত জনপ্রিয়। তিনি নিজেই বলেছিলেন যে এই উপন্যাসটি পৃথিবীর সেই ভূখণ্ডের যেখানে শিশুরা জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো বই পড়ার সুযোগ পায় না অথবা একটু উষ্ণ আশ্রয়, যেখানে এক টুকরো রুটির জন্যে মেয়েরা তাদের দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হয়। *Les Miserables*-এর আগে লেখা *The Last Day of a Condemned Man*, ভিক্টর হুগোর ছোট্ট একটি নির্মম অনুভূতির রূপরেখা যা তার পরের উপন্যাসটির মতোই সমান শক্তিশালী এবং দেশকালের গণ্ডী পেরিয়ে সার্বজনীনতার মাপকাঠিতে একইরকম সফল।

আমাদের কোনোমতেই ভোলা উচিত নয় যে, হুগো মনে প্রাণে একজন ফরাসি—এক বিপর্যস্ত সময়ের। বাস্তবিকভাবে ফ্রান্স নিজেকে মেলে ধরেছে এমনভাবে যেমন করে হুগো তাঁর আবেগ, পারিবারিক অনুভূতি, চলতি রসিকতা আর সুবিচারের আশায় আত্মস্থ থেকেছেন—প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন সেই বিকৃত, রক্তমাখা শ্লোগান—লিবার্তে ইগালাইট, ফ্রাটারনাইট-কে পূনর্বাসন দেওয়ার প্রচেষ্টায়। বর্তমান ফ্রান্সও সে সম্পর্কে অবহিত। আর তাই ২০০২ সালে হুগো-র মৃত্যুর দ্বিশত বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ফ্রান্সের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি হাস্যকরভাবে তাঁকে জাতির নায়ক হিসাবে স্বীকার করার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল। সোশ্যালিস্ট নেতা লিওনেল জসপিন, লা মিজারেবলস-এর নায়ক জ্যাঁ ভ্যালজ্যাঁ-এর সঙ্গে নিজেকে এক সারিতে দাঁড় করালেন। জ্যাক শিরাক-এর অনুগামীরাও একই কাজ করলেন এই বলে যে জসপিন-এর সঙ্গে নষ্ট চরিত্র পুলিশ জ্যাভার্ট-এর বেশ মিল আছে। জ্যাঁ পিয়ের শভানমোঁ-ও একই কায়দা অনুসরণ করলেন। সারা দেশের খবরের কাগজ হুগো ম্যানিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়লো ঠিক তেমনি করে যেমনটি ঘটেছিল ১৮৮৫ সালে যখন এই শক্তিশালী লেখক মারা গিয়েছিলেন। আর্ক দ্য ট্রাইয়াম্ফ কালো ভেলভেটে মুড়ে ফেলা হয়েছিল বিশাল রাষ্ট্রীয় শোক পালনের জন্য (যে অনুষ্ঠানে

BanglaBook.org

প্যারিস-এর যা মোট লোকসংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি লোক অংশগ্রহণ করেছিল)। অবশ্য জীবদ্দশাতেই হুগো একজন পরম শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তিনি নিজেই একটা গল্প বলেছিলেন যে—বুড়ো বয়সে একদিন বেশি রাত করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে তাঁর বেদম জোরে পেচ্ছাব পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাড়ির দ্বাররক্ষককে জাগাতে এবং বেগ সামলাতে না পেরে তিনি নিজের বাড়ির দেওয়ালেই পেচ্ছাব করে দিয়েছিলেন। সেখান দিয়ে এক তরুণ তখন যেতে যেতে তাঁকে ওই কাজ করতে দেখে প্রচণ্ড ধমকে দিয়েছিল—ছিঃ ছিঃ, কী করে আপনি এমন কাজ করতে পারলেন! তাও কিনা ভিক্টর হুগো-র বাড়ির সামনে!

সেই দ্বিশত বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তাঁকে ইউনাইটেড ইউরোপীয়ান কারেন্সি-র জনক হিসাবে সম্মানিত করা হয়। এই মুদ্রার জন্য তিনিই প্রথম ১৮৫০ সালে প্রচার শুরু করেছিলেন। হুগো ছিলেন উদার গণতন্ত্রের এক প্রবক্তা। তবে ফরাসি সিনেটের স্পিকার, ক্রিস্টিয়ান পঁসলে-এর উক্তিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য—তিনি বলেছিলেন 'হুগো কারও একার নন। অদৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে ও প্রগতির স্বার্থে সমগ্র মানবতা যেন তাঁর মধ্যে দেহ ধারণ করে ছিল।'

এই অদৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ এবং প্রগতিবাদই ছিল হুগোর লেখনীর বিশেষতা। বহু রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র থাকলেও, সব সময় মনে প্রাণে তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমাজের আরো উন্নতি বিধান সব সময়ই সম্ভব। কেউ কেউ তাঁকে ফরাসি 'শেক্সপীয়র' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু ডিকেন্স-এর সঙ্গে তুলনায় তাঁর স্থান আরও উঁচুতে। তাঁর কাজের মূল্যায়ন করতে বসলে দেখা যায় যে তাঁর লেখায় একটা সমুন্নত ভয় জাগানো সমবেদনার সঙ্গে যোগ হয়েছে নিরন্তর এক ডিকেন্সিয়ান আবেগ। অপরাধী সাব্যস্ত করনের প্রক্রিয়াকে তিনি সবসময়ই নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। ছোট্ট মেয়েদের গোলাপি গাল, শৈশবের তৃণভূমি, গরাদের ফাঁক দিয়ে এসে বন্দিদের গায়ে লাগা সূর্যকিরণের ছোঁয়া, জেলের ছাদে পাখির মিঠে গানের সুর, শীতে কেঁপে কেঁপে ওঠা বিপর্যস্ত বৃদ্ধাদের মাটির পাত্রে কয়েক টুকরো জ্বলন্ত কাঠকয়লার অনুপস্থিতি—এই সবই ভিক্টর হুগো আইনবেত্তাদের কাছে সুবিচার পাওয়ার আশায় ব্যবহার করেছেন।

এই ছোট্ট নভেলটি যেন তাঁর বিশ্বাস ও স্বপ্নের আরক। তাঁর বয়স যখন সবেমাত্র ২৭ বছর তখনই তিনি এটি লিখেছিলেন। গিলোটিনের সঙ্গে তাঁর দেশের এত প্রণয় তিনি কোনোমতেই সহ্য করতে পারতেন না। এই মৃত্যুদানবরূপী মেশিনটি বয়সে তাঁর চেয়ে মাত্র বছর তিনেকের মতো বড় ছিল। মৃত্যুদণ্ডকে তিনি শুধু নৃশংস ও ভয়ংকরই বলেন নি, এর প্রয়োগকে তিনি নির্বুদ্ধিতা বলেও অভিহিত করেছেন। এই চরম দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তাঁর বিবমিষার একটিই কারণ যা হলো এই দণ্ডাদেশের পিছনে সমস্তরকম যুক্তির অসারতা

'যে মানুষটাকে আপনারা শাস্তি দেন, হয় তার কোনো পরিবার পরিজন নেই, আত্মীয় স্বজন নেই, এই সমাজে, সংসারে কোনো বন্ধনই তার নেই। এক্ষেত্রে সে হয়তো স্কুলে পড়তে পায়নি, কোনো শিক্ষা পায়নি; তার হৃদয়, তার অনুভূতির কথা কেউ হয়তো কখনো ভেবেও দেখেনি। এইরকম এক হতভাগ্য অনাথকে কোন অধিকারে আপনারা মেরে ফেলতে পারেন? আপনারা ওকে শাস্তি দিচ্ছেন কারণ ও এক বঞ্চিত, লাঞ্ছিত বলে, শিক্ষা পায়নি বলে, সহায় সম্বলহীন বলে?... ওর ভাগ্যই হচ্ছে তাহলে আসল অপরাধী, কোনোভাবেই ও নিজে নয়। সুতরাং আপনারা এক নির্দোষ মানুষকে শাস্তি দিচ্ছেন।

BanglaBook.org

'অথবা লোকটির হয়তো একটি পরিবার আছে—আর সেক্ষেত্রে আপনারা কি বিশ্বাস করেন যে তার গলাটা কেটে দিলে সেই শুধু একমাত্র শান্তি পাবে?... এক্ষেত্রেও আবারও আপনারা নিরপরাধদেরই শাস্তি দিচ্ছেন!'

চরম শাস্তিবিধানের বিরুদ্ধে এই বক্তৃতা তো বর্তমান কালের যে কোনো উদার মানুষই দিতে পারতো। কিন্তু তাঁর সময়েও ভূমিকাটিতে তার বিদ্রূপ সঠিক জায়গাটিতেই ঘা দিতে পেরেছিল। কিন্তু দণ্ডিত মানুষটি যখন নিজে তার ডায়েরি লিখছে তখন তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল। হুগো-র এই দণ্ডিত মানুষটির চরিত্র এ পৃথিবীর বাইরের নয় কখনো সে হতবাক, সন্দেহপ্রবণ, রাগী, শোকাচ্ছন্ন অথবা নিদারুণ মনস্তাপে আচ্ছন্ন। তার মতো অবস্থায় পড়লে আমরা যে কেউই তার মতোই ব্যবহার করতাম।

উপন্যাসটির সার্থকতা এর বর্ণনায়। জেলের অধিবাসী ও জেলের অন্তপুরকে খুব কাছ থেকে দেখে দেখে নিপুণ দক্ষতায় আঁকা হয়েছে এই বইটিতে। মাত্র কয়েকটা লাইন পড়লেই আমরা অবলীলাক্রমে যেন জেলের অভ্যন্তরে ঢুকে যাই। রাত্রিতে সেই আলোর স্বল্পতা, পাথরের ঠান্ডা মেঝে, কয়েদীদের নোংরা ও মোটা কাপড়ের পোশাক পরিচ্ছদ, কারারক্ষীদের শিষ্টাচারে! আঁতকে ওঠা এইসব পড়তে পড়তে আমরাই যেন সশরীরে জেলের মধ্যে বন্দি হয়ে যাই। জর্জ অরওয়েল যেমন তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে বার্মা-তে সংঘটিত এক মৃত্যুদণ্ডের বর্ণনা করেছিলেন তেমনি এই কয়েদীও বর্ণনা করেছে এক ভয়াবহ অনুভূতির কথা। সে জানে যে একটি দেহ যা এই মুহূর্তে ভীষণ জীবন্ত খুব শীঘ্রই তা মৃত বলে গণ্য হবে। আর সেই মৃত্যু আসবে কোনো অপঘাতে বা কোনো প্রাকৃতিক নিয়মে নয়, আসবে মানুষেরই আদেশে।

'আমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ শোনার আগে আমি জানতাম যে আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা কাজ করছে, আমার দেহটাও সমাজের অন্য মানুষজনের সঙ্গে বসবাস করছে; কিন্তু এবার যেন পরিষ্কার দেখতে পেলাম যে মুহূর্তের মধ্যে আমার ও অন্য সকলের মাঝখানে একটা আড়াল তুলে দেওয়া হলো। এবার আর কোনো কিছুই আগের মতো রইলো না।'

হুগো যখন অতি সযত্নে বৈচিত্র্যময় টুকরো টুকরো নানান অধ্যায়ে বিভক্ত করে লেখাটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন তখন প্রতি মুহূর্তেই গল্পটি গতিময়তা অর্জন করতে থাকে। কোনো কোনো সময় সেই গতি দুঃস্বপ্নের রূপরেখা পেয়ে যায় যখন লেখক অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব নির্ভুলতায় আসন্ন মৃত্যুর দিকে কয়েদীকে নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। কখনো বা লেখাটি পৌঁছে যায় মর্মান্তিক এক কমেডির দোড়গোড়ায় যখন তিনি আবিষ্কার করেন অনুভূতিহীন, নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় এক যাজকের ধর্মোপদেশ যা শুধু তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের জন্যই রুটিনমাফিক শুনিয়ে যান। গোটা গল্পটির অন্তর্নিহিত বিশাল শূন্যতা লেখকেরই ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি। হুগো এক জায়গায় এমন ভান করেছেন যে মনে মনে আমরা প্রস্তুত হয়ে উঠি সেই অপরাধের কাহিনী শোনার জন্য যা আমাদের কয়েদীটি করেছে। কিন্তু যে অধ্যায়টা খুঁজে পাওয়া গেল না (৪৭) হয়তো সেটাই আমাদের শোনাতে পারতো যে ঘটনার নায়ক কোন আবেগের বশবর্তী হয়ে একটা খুন করতে বাধ্য হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে এই যে ঘটনাটা শোনা হলো না তাতে বোধহয় লেখকের অব্যক্ত বক্তব্যটা আরো অনেক বেশি জোরালোই হলো। অবশ্যই হুগো, এতে কিছু এসে যায় বলে হয়তো ভাবেন নি। কারণ আইন যাকেই হত্যা করবে হয় সে এক বন্ধুহীন বিপর্যস্ত অবস্থার শিকার অথবা কোনো এক পরিবারের অতি আপনার জন, সে যাই হোক না কেন দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু এক

BanglaBook.org

নিরপরাধই শাস্তি পাচ্ছে, (আর ১৮২৯ সালে সেই পরিবারটির শুকিয়ে মরা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ই ছিল না)। তাহলে বুদ্ধিবৃত্তি, সহমর্মিতারা কোথায় গেল? ১৮২৯ সালে নিজে একজন স্বামী, এক পিতা হয়ে হুগো যেন এই কথাটিই জানতে চেয়েছেন ওই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীটির মধ্যে নিজেকে আত্মস্থ করে। কিন্তু তাতেই বা কী লাভ? যদি আমরা স্বীকারও করে নিই যে ঘটনার নায়ক এক খুনী আসামী তবু সে-ই তো সমস্ত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের প্রতিভূ—প্রবক্তা—যারা বিচারের প্রহসনের শিকার!

প্রায় চল্লিশ বছর আগে ফ্রান্সে আমি যখন স্কুলের ছাত্র তখনই এই বইটা প্রথম পড়ি। কাহিনীটা প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম যদি না জিওফ উলেন-এর মাটির কাছাকাছি ভাষায় নতুন করে আবার তাঁর অনবদ্য অনুবাদটা ছাপা হতো বর্তমান যুগেও একটা আলোড়ন তুলতে। সেই চটজলদি বিচারের প্রহসন, সেই অপার্থিব ভয়, সেই ক্রোধ, সেই বিসদৃশ কবিতার লাইনগুলো সব যেন মনের মধ্যে পূর্ণশক্তিতে আবার ফিরে এলো। এটি লেখকের নিজের দেশের এক বিশেষ সময়ের ঘটনা—কিন্তু বিসেত্রে প্রিজন, হত্যামঞ্চের ওপরে নটরডেম-এর মৃত্যুর মতো শীতল ভয়াবহতা এসবই পাঠকেরা যেন সব জায়গাতেই দেখতে পাবেন—এমনই লেখকের বর্ণনা। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে এই উপন্যাস হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয় পৃথিবীর বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের উদ্দেশ্যে এক আগুন ঝরানো বক্তব্য। হোক না সে আমেরিকার ইলেকট্রিক চেয়ারে অথবা মারন ইনজেকশানের যুগে বা কাবুলের ফুটবল মাঠে তালিবান হত্যাকারীদের কাছে। মজার কথা এই যে খোদ ফ্রান্সেও ২০০২ সালে মৃত্যুদণ্ডের সপক্ষে সওয়াল করা প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জঁ ম্যারি লে পঁ নির্বাচনে মাত্র ২০ শতাংশ ভোট পেয়ে হেরে গিয়েছিলেন।

এই লে পঁ-ই হচ্ছেন ফ্রান্সের একমাত্র রাজনৈতিক নেতা যিনি কোনোদিনই তাঁর দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের আলোকবর্তিকার ধারক ও বাহক বলে দাবি করতে পারবেন না। হুগো বলেছেন দেশ কালের গণ্ডি পার হলেও, মৃত্যুদণ্ডকে কোনোদিনই সমর্থন করা যায় না। তবু যারা এই শাস্তিতে বিশ্বাসী তাদের এই বইটি পড়া অবশ্য কর্তব্য যাতে তারা অবাক বিস্ময়ে ভাবতে পারে যে মাত্র ২৭ বছরের এক তরুণ যে এই নিষ্ঠুর যুগে জন্ম নিয়েছিল সে কেমন করে এইরকম স্পর্শকাতর এক স্থির সত্যে পৌঁছানোর সাহস দেখাতে পারে এবং যে শক্তি যখন তাঁর দেশ শাসন করতো তারই বিরুদ্ধে সমস্ত ভয় উপেক্ষা করে এইরকম এক বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে।

—লিব্বি পার্ভেস

২০০২

BanglaBook.org

ভূমিকা

বইটির প্রথম সংস্করণে লেখকের নামের কোনো উল্লেখই ছিল না। পরিবর্তে নিচের ক'টি লাইন ভূমিকা হিসাবে লেখা ছিল

> "এই বইটির অস্তিত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দুভাবে দেওয়া যেতে পারে। হয় খুঁজে পাওয়া বিভিন্ন আকার আকৃতির একগাদা হলুদ হয়ে যাওয়া কাগজে কোনো এক হতভাগ্য অপরাধী তার শেষ ভাবনা-চিন্তাকে পর পর সত্যিই লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছিল। অথবা শিল্পের খাতিরে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম স্বপ্নদর্শী এক মানুষ অথবা একজন দার্শনিক অথবা হয়তো এক কবির কল্পনাই এর জনক। তারপর সেই কল্পনা তাঁকে এমনভাবে সম্মোহিত করে রেখেছিল যে তাকে একটি পুস্তকাকারে রূপান্তরিত করার আগে পর্যন্ত তিনি কোনোমতেই সেই কল্পনার গ্রাস থেকে মুক্তি পাননি। সুধী পাঠক, এই দুটি সম্ভাবনার মধ্যে যেটা তাঁর ভালো লাগবে সেটাই তিনি বেছে নিতে পারেন।"

এটা লক্ষণীয় যে, যখন এই বইটি প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল সেই সময় লেখক তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে চাননি হয়তো এই ভেবে যে সেটা সময়োপযোগী হবে না। বদলে তিনি অপেক্ষা করাটাই শ্রেয় ভেবেছিলেন যতদিন পর্যন্ত না তাঁর মতামত উপলব্ধ হচ্ছে। অথবা আদৌ হবে কি না সেটা তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। সুখের কথা যে, তাঁর মতামত উপলব্ধ হয়েছিল। আজ আপামর জনসাধারণের কাছে তিনি তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনা-চিন্তাগুলোকে অকপটে প্রকাশ করতে পারেন যা তিনি এতদিন করেছেন এই নির্দোষ ও স্বচ্ছ সাহিত্যকর্মের অন্তরালে, আজ তিনি জোর গলায় বলতে পারেন 'দণ্ডিতের শেষ দিন' বইটি মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করার জন্য এক আবেদন। সেই আবেদন করা হয়েছে সোজাসুজি না ঘুরিয়ে তা বিচারের ভার পাঠকের। তাঁর এই কাজের যদি কোনো মূল্যও থাকে তাহলে এর মাধ্যমে যা তিনি করতে চেয়েছেন ও পরবর্তী প্রজন্মকে তার সাক্ষী রাখতে চেয়েছেন তা হলো যে তিনি কোনো একজনমাত্র নির্দিষ্ট অপরাধী অথবা পছন্দসই কোনো এক প্রতিবাদীর সপক্ষে কোনো আপিল বা আবেদন করতে চাননি। কারণ সেই আপিলের নিষ্পত্তি করা যেমন সহজ তেমনি তার গুরুত্বও ক্ষণস্থায়ী। বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত অপরাধীদের হয়ে তিনি চিরকালীন এক আবেদন রাখতে চেয়েছেন সমাজের কাছে, যা তাঁর চোখে সর্বোচ্চ আদালতের সমতুল্য, যাতে মানবিক অধিকার সম্পর্কিত আইনের একটি প্রধান ধারাকে উল্লেখ করে তার উল্লঙ্ঘনের ব্যাপারে সর্বশক্তি দিয়ে সওয়াল জবাব করা যায়। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নিষেধের বাণী 'অ্যাভোরেসসিয়ার আ স্যাঙ্গুইন' [রক্তপাতকে ঘৃণা করো] মাথায় রেখেই সমস্তরকম প্রধান প্রধান অপরাধের বিচার করা

BanglaBook.org

উচিত। অপরাধী সাব্যস্তকরণের পর জীবন মৃত্যুর প্রশ্নটি বিচারশালার প্রহসনের নিচে দমবন্ধ ও পিষ্ট হয়ে যায়। জীবন মৃত্যুর এই অন্ধ বিমর্ষ প্রশ্নটিকে নগ্ন করে, উলঙ্গ করে, বিচারশালার কচকচানি শেষ হলে তাকে টেনে হিঁচড়ে সূর্যালোকে দাঁড় করানো হয় তার ভয়াবহ কক্ষপথে, বিচারশালায় যার শেষ নয়, যার শেষ ফাঁসির মঞ্চে, জজের হাতে নয়, ঘাতকের হাতে।

এইসব কথা বলাই তো তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হয়তো আশা করা অন্যায়, তবু তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম যদি বুঝতে পারে যে কতখানি বেদনার্ত হয়ে তিনি এই বইটি লিখেছেন তাহলে সেটাই হবে তাঁর পরম প্রাপ্তি। ওইটুকু ছাড়া অন্য কোনো সম্মানের আশা তিনি করেন না।

সুতরাং আজ দৃপ্তস্বরে বারবার তিনি ঘোষণা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত নন যে দোষী বা নির্দোষ যাই হোক না কেন পৃথিবীর সমস্ত বিচারশালায়, সমস্ত *জুরিদের* সামনে, সমস্ত বিচারকদের কাছে এবং সমস্ত রকম ন্যায় নীতির সামনে তিনি সর্বকালের সমস্ত অপরাধীদের প্রতিনিধি, আর এই বইটি লেখা তাঁদের উদ্দেশ্যে যারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন বিচারের রায়। সেই কারণে অপরাধীদের এই প্রতিনিধির বক্তব্যের গুরুত্ব সীমাহীন। এবং এই একই কারণে 'দণ্ডিতের শেষ দিন' বইটি লেখার সময় তিনি চেষ্টা করেছেন যতটা সম্ভব অনিশ্চয়তা, অঘটনতা, নির্দিষ্টতা, বিশেষতা, সম্পর্কীয়তা, পরিবর্তনীয়তা, অনিয়মতা, সংক্ষিপ্ততা, এবং সঠিক নাম ও ঘটনাকে এড়িয়ে যেতে। এবং এভাবেই তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন (অবশ্য যদি সেটাকে সীমাবদ্ধ রাখা বলা যায়) যাতে সেই দণ্ডিতের জন্য তিনি ওকালতি করতে পারেন যাকে যে কোনো কৃত অপরাধের জন্য পৃথিবীর যে কোনো স্থানে যে কোনো দিন কোতল করা হয়েছে। শুধু লেখনীর সাহায্যে যদি তিনি কোনো একজন ম্যাজিস্ট্রেট-এর বুকের গভীরে সহানুভূতির শিরামুখ খুলে দিতে পারেন তাহলে সেটাই তো অনেকখানি প্রাপ্তি বলে বিবেচিত হতে পারে। অথবা সেইসব লোকেদের মধ্যে যদি অনুকম্পা জাগাতে পারেন যাঁরা নিজেদের কাজকে এতকাল সঠিক মনে করে এসেছেন। অথবা বিচারকের মনটাকে এতটাই কোমল করে তুলতে পারেন যাতে তিনিও জীবন নেওয়ার বদলে জীবনদানেই বেশি সচেষ্ট হন।

বছর তিনেক আগে বইটা যখন প্রথম বেরিয়েছিল তখন এই লেখাটির পেছনে লেখকের প্রেরণার উৎস সন্ধান নিয়ে বিতর্ক করা ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না। কেউ বলতো এটা ইংরেজি কাজ। অন্যেরা বলতো—না না আমেরিকান। ওফ্! ওদের অনুসন্ধিৎসা কি ভুল পথেই না গিয়েছিল! নইলে হাজার হাজার মাইল দূরে কেউ উৎস খোঁজে? নাকি বাড়ির নর্দমা দিয়ে যে পানি বয়ে যায় নীলনদই যে তার উৎস একথা কেউ বলতে পারে? হায়! এখানে কোনো ইংরেজি বইই নেই। নেই কোনো আমেরিকান বা চাইনিজ বইও। লেখক তাঁর প্রেরণা কোনো বিদেশি বই থেকে পাননি। সাধারণত তিনি তাঁর আবাসস্থলের চারপাশটাই ভালো করে লক্ষ করেন আর সেখান থেকেই লেখক তাঁর 'দণ্ডিতের শেষ দিন' বইটি লেখার প্রেরণা পান। যেখানে আপনারা আছেন সেখানে ছাড়া আর অন্য কোনো জায়গায় এত কিছু কি দেখতে পাবেন? এখানে এমন মানুষ কি আছে যিনি মনে মনে 'দণ্ডিতের শেষ দিন'-এর মহড়া দেননি অথবা তাকে হত্যা করেননি? খুব সাদা কথায় বলতে গেলে জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট এক জায়গায় যার নাম প্লেস দ্য গ্রীভ-এ হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত হতো। এখান দিয়ে একদিন যেতে যেতে গিলোটিনের নিচে রক্তে মাখামাখি এক শায়িত মুণ্ডুহীন লাশ দেখেই লেখক এই বীভৎস মৃত্যুকে ঘিরে ভাবনায় বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

তারপর থেকে কোর্ট অব আপিল যখন প্রতি বৃহস্পতিবারে একটি করে মৃত্যুদণ্ডের কথা ঘোষণা করতো, গোটা প্যারিস শহরটায় ঘোষণাকারী গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে

BanglaBook.org

অবশেষে লেখকের বাড়ির জানালার নিচ দিয়ে চলে যেতো (ঘোষণাকারীর দায়িত্ব ছিল *লা গ্রীভ*-কে মানুষের ঢল নামিয়ে ভরিয়ে তোলা), তখন থেকেই সেই নাছোড়বান্দা ভাবনাটা তাঁর কাছে ফিরে আসতো, তাঁকে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরতো, তাঁর মাথাটা ভর্তি করে দিতো পুলিশ, ঘাতক আর হাজার হাজার জনতায়, যারা লেখকের সঙ্গেই থাকতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই হতভাগ্য মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটির শেষ নির্যাতনের সাক্ষী হয়ে, যাকে এইমাত্র যাজকের কাছে শেষ স্বীকারোক্তি করানো হলো, চুল কামিয়ে দেওয়া হলো, এইবার ওর হাত দুটোও বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। কবির দুর্বল কণ্ঠ তখন ব্যবসায়ী সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে চেয়েছে যখন এইসব বর্বর ও নৃশংস কাজগুলো সংঘটিত হচ্ছে। কবি তখন সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত কবিতার লাইন তখন তাঁর মাথা থেকে উধাও। অভ্যাশবশত যদি দু'চারটে লাইন তিনি মিলিয়েও থাকেন তবে পরমুহূর্তেই তিনি সেগুলোকে ভুলে গিয়েছেন ইচ্ছাকৃতভাবেই। তাঁর সব কাজ যেন থমকে গিয়েছিল, ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তিনি তখন একই ভাবনায় আক্রান্ত, নিমজ্জিত ও বন্দি হয়ে ছিলেন, সেটা যেন একটা নির্যাতনের মতো মনে হচ্ছিল, যার শুরু হতো অনেক রাতে এবং চলতো ভোর চারটে পর্যন্ত যেমন করে অন্য এক হতভাগ্যও জেলের অন্তরালে নির্যাতনের শিকার ঠিক ওই সময় অবধিই হতো। এরপর তো সেই হতভাগ্য গিলোটিনের নিচে মাথা নিচু করে—এবং মারাও যায়। যে মরণের কথা শুধু ঘড়িটার বিষাদাচ্ছন্ন বাজনা ঘোষণা করলে তবেই যেন লেখক একটু বুকভরে প্রশ্বাস নিতে পারেন। খানিকটা মানসিক শান্তি যেন ফিরে আসে তাঁর। যদি স্মৃতিভ্রম না হয়ে থাকে তাহলে আলবাক[১]-এর হত্যাকাণ্ডের পরদিন থেকেই তিনি এই বইটি লেখা শুরু করেন। আর লেখাটা শুরু করেই যেন তিনি অপার শান্তি পান। যখন এইরকম একটা জঘন্য সামাজিক অপরাধ যাকে বিচার বিহিত দণ্ড নাম দিয়ে কার্যকর করা হয় সে সময় তাঁর বিবেক তাঁকে এই বলে মুক্তি দেয় যে এইরকম একটা নৃশংস কাজে অন্তত তাঁর নিজের কোনোপ্রকার সংশ্লিষ্টতা নেই। আর তাই লা গ্রীভ-এ যত রক্ত ঝরে পড়ে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মাথার ওপর তার মধ্যে একটি ফোঁটাও লেখকের কপাল বেয়ে নেমে এসে তাঁকে রক্তাক্ত করতে পারে না, অপরাধী করতে পারে না।

তবে এইটুকুই তো শেষ কথা নয়। নিজের কোনো সংস্রব নেই বলে ঘটনার দায়ভার থেকে মুক্তি পাওয়া হয়তো ভালো, কিন্তু এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার প্রচেষ্টা তার চেয়েও শতগুণে বেশি জরুরি।

সুতরাং মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বিলোপ করার জন্য প্রচার করা ছাড়া জীবনে অন্য কোনো কাজকেই তিনি অধিক শ্রেয়, পবিত্র অথবা উচিত বলে বিবেচনা করতে পারেন নি। আর ঠিক একই কারণে তিনি সমর্থন করেন সেইসব মহান মানুষদের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টাকে যাঁরা বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন এই, "গিলোটিন গাছটা"কে শেকড়সমেত উপরে ফেলতে, যাকে বিপ্লব পর্যন্ত উপড়ে ফেলতে অক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে। গর্বের সঙ্গে বলা যায় যে, এই লেখকের মতো এক অকিঞ্চিৎকর মানুষও তার কুঠারের লক্ষ্য স্থির করেছে সেই খাঁজটার দিকে যা বেক্কারিয়া-ও লক্ষ করেছিলেন ছেষট্টি বছর আগে সেই প্রাচীন ক্রুশটার গায়ে যার নিচে এত শতাব্দী ধরে খ্রিস্টান ধর্মের আশ্রয়।

আগেও বলা হয়েছে যে ফাঁসির মঞ্চকে বিপ্লবীরাও ধ্বংস করতে পারেনি। কারণ, রক্তপাত ছাড়া বিপ্লব হয় না। এবং যেহেতু বিপ্লব কেটে ছেঁটে সমাজকে পরিশুদ্ধ করে তোলে, সেই কারণে মৃত্যুদণ্ড তার কাছে একটা কাঁচির কাজ করে। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিপ্লব তাই কাঁচিটার কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

BanglaBook.org

যাই হোক, আমরা মনে করি যে যদি কোনো বিপ্লব এই মৃত্যুদণ্ডকে সমূলে উৎপাটনের ক্ষমতা রেখে থাকে তাহলে তার নাম জুলাই বিপ্লব। বর্তমান কালের সবচেয়ে ক্ষমাশীল এক গণউত্থানের জন্য সময়টাও হয়তো ভালোই ছিল যাতে লুই একাদশ, রিসলিও ও রোবসপিয়ার-দের অমানবিক, নৃশংস, বর্বর ফৌজদারী আইনকানুনগুলোকে সমূলে বিনষ্ট করা যায় এবং মানুষের জীবনকে অক্ষত রাখার দাবীকে আইনসঙ্গতভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়। তিরানব্বই সালের গিলোটিনের ইস্পাত-ব্লেডকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেওয়ার জন্য সত্যিই উপযুক্ত ছিল এই ১৮৩০ সাল।

কিন্তু মাত্র সামান্য ক'টি দিনের জন্যই আমরা এই ভাবনাকে প্রশ্রয় দিতে পেরেছিলাম। ১৮৩০ সালের আগস্ট মাসে, চারপাশে এত পরার্থপরতা ও করুণা ছিল, জনমানস সহমর্মিতা ও সভ্যতার নেশায় এত অনুপ্রাণিত ছিল, এবং গৌরবময় ভবিষ্যতের স্বপ্নে মানুষের হৃদয় এত উদ্বেল ছিল যে আমরা ভেবেছিলাম মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ব্যাপারটা, মৌনভাবে হলেও যেহেতু মতামতটা এর বিপক্ষে সর্বসম্মত ছিল, তাই সেটা বোধহয় সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যাবে। যেমনটা ঘটেছিল অন্যান্য সব খারাপ অভ্যাসের ক্ষেত্রে, যেগুলো এতকাল আমাদের তাড়া করে ফিরতো। পুরনো জমানার বাতিলযোগ্য অবশিষ্টাংশ নিয়ে বহ্ন্যুৎসব মানুষজনের সবে সারা হয়েছে। আর যেহেতু এটা ছিল একটা রক্তাক্ত অবশিষ্টাংশ তাই এটাকেও শেকড় সমেত তুলে বাতিলের দলে ফেলে দেওয়া হয়েছে এমনটাই আমরা ভেবেছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম যে অন্যান্য সবকিছুর সঙ্গে এটাকেও বোধহয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই প্রচণ্ড বিশ্বাসে কয়েকটা সপ্তাহ আমরা আশা পোষণ করেছিলাম যে, ভবিষ্যতে স্বাধীনতার মতো আমাদের জীবনও সুরক্ষিত থাকবে।

তার চেয়েও বড় কথা, এর পরের দু'মাসের মধ্যেই কাইজার বনসানার[২] এই পরিপ্রেক্ষিতে উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনাকে আইনসম্মত রূপদানের এক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই প্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত আনাড়ি এবং ভণ্ডামিতে পূর্ণ। কারণ এমন সব কারণের জন্য এই প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের উপকারের কোনো সম্পর্ক ছিল না বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হবে না।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৮৩০ সালের অক্টোবর মাসে নেপোলিয়ন-কে গিলোটিনে হত্যার বিরুদ্ধে গোটা মন্ত্রীসভা হঠাৎই কাঁদতে শুরু করেছিল। শেষমেষ হত্যা-প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেলে ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা-প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল আরও কিছু পরে। কী কারণে সেটা পরে বলা হচ্ছে। সেদিন মনে হয়েছিল যে হঠাৎই ক্ষমাশীল হওয়ার প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য আইন প্রণেতাদের বুকগুলো সব ফেটে যাচ্ছিল, কত সব বক্তারা উত্তেজিতভাবে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিল। হঠাৎ হঠাৎ ওরা শিউরে উঠছিল, আর্তনাদ করে উঠছিল মৃত্যুদণ্ডের বীভৎসতার কথা বলতে বলতে। ওদের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আকাশের দিকে বার বার উঠছিল, মৃত্যুদণ্ড! হা ঈশ্বর! ওফ্ কি ভয়ংকর! সরকারি পক্ষের কিছু বয়স্ক উকিল যারা লাল পোশাক গায়ে দিতে দিতে চুল পাকিয়ে ফেলেছিল, যারা অপরাধীকরণের সুবাদে সারা জীবন ধরে রক্তে ভেজানো রুটির স্বাদ পেয়ে আসছিল, অকস্মাৎ তাদেরই প্রাণ দরদে উথলে উঠেছিল এবং নির্লজ্জের মতো তাদের বলতে এতটুকু বাধেনি যে গিলোটিনকে তারা সর্বান্তকরণে ঘৃণা করে, গোটা দুটো দিন ধরে রাজদ্রোহী নেতা তথা শোকপ্রকাশকারীদের বক্তৃতা করার জন্য ডাকা হলো। অবশেষে সেটা হয়ে উঠলো এক সর্বসাধারণের বিলাপ, এক শ্মশান সঙ্গীত, বিষাদাচ্ছন্ন গানের ঐক্যতান, আ সুপার ফ্লুমিনা ব্যাবিলনিস, আ সাবাত মাঁতার ডলোরোসা। সি-সার্পে সে

BanglaBook.org

এক মহান ঐক্যতান সভাকক্ষের বেঞ্চে বসে থাকা সমস্ত বক্তারা যা গেয়েছিল। একজনের খাদ তো অন্যজনের চড়া সুর। আহ! সেইসব ঐতিহাসিক দিনগুলোতে কি অপূর্ব গানই না ওরা গেয়েছিল! কোনো অভিব্যক্তিরই অভাব অনুভূত হয়নি। এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য আগে আর কখনো দেখা যায়নি। বিশেষ করে সারারাত ধরে ওদের বসে থাকাটা, আহা! কি মহাপ্রাণ মানুষ ওরা! কি কোমল ওদের হৃদয়। দৃশ্যটা চোখ ফেটে পানি আনার মতো, যেন লা চস্‌সে নাটকের শেষ অঙ্ক। গ্যালারিতে বসে থাকা সব দর্শকের চোখই তখন ভেজা।

তাহলে গোটা ব্যাপারটা কী ছিল? মৃত্যুদণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা?

উত্তর : হ্যাঁ এবং না।

গোটা ঘটনাটা ছিল এরকম

পৃথিবীর চারজন মানুষ। চারজন মানুষ—হ্যাঁ যাঁদের সামাজিক কৌলিন্য ছিল সন্দেহাতীত। হয়তো কোনো বিউটি পার্লারে ওঁদের দেখা হয়েছিল এবং হয়তো সেখানেই ওনারা সনাতনরীতি অনুযায়ী কিছু কথা নিজেদের মধ্যে চালাচালি করেছিলেন। তারপর ওঁরা চারজন ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন। ব্যাকন যাকে অপরাধী বলে গণ্য করেছিলেন আর ম্যাকিয়াভেলি যাকে বলেছিলেন দুঃসাহসিক কাজ। তা সে অপরাধই হোক অথবা দুঃসাহসিক কাজই হোক, আইনের চোখে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড হওয়াই স্থির হয়েছিল। সুতরাং আইন ভাঙার অপরাধে ওঁনারা বন্দি হয়েছিলেন। রাখা হয়েছিল ভিন্সেনেস[৩]-এর সুন্দর ভল্ট-এর নিচে। পাহারায় ছিল তেরঙ্গা পোশাকে সজ্জিত তিনশো পাহারাদার। কী করা উচিত এঁদের নিয়ে এবং কীভাবে করা উচিত? বুঝবার চেষ্টা করুন, এঁদের তো আর সাধারণ লোকের মতো শেকলে বেঁধে একটা ঘোড়ার গাড়িতে গাদাগাদি করে বসিয়ে লা গ্রীভ -এ চালান করা সম্ভব নয়! তাও আবার একটা সরকারি চাকুরের গা ঘেষে বসে! যার নামই কেউ কোনোদিন শোনেনি! আমার আপনার মতো কি এই চারজন! এঁদের জন্য যদি করতেই হয় তাহলে মেহগনি কাঠ দিয়ে গিলোটিনের মঞ্চটা তৈরি করা উচিত।

কিন্তু দাঁড়ান! এঁদের জন্য মৃত্যুদণ্ড রহিতই বা কেন নয়? যদিও তা করতে গেলে মন্ত্রীসভার সদস্যদের অনেক কাজ করতে হবে।

ভদ্রমহোদয়গণ! মনে রাখবেন যে মাত্র ক'টা দিন আগেই তো মৃত্যুদণ্ড রহিতের ব্যাপারে আপনাদের মন্তব্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে সময় তো আপনারা এটাকে 'অলীক,' 'কল্পনামাত্র,' 'স্বপ্ন,' 'পাগলামো,' 'কবি মানসের আকাঙ্ক্ষা মাত্র' এইসব আখ্যা দিয়েছিলেন। মনে রাখবেন, ঘোড়ার গাড়িটার দিকে, মোটা মোটা দড়িগুলোর দিকে, গাঢ় লালরঙা মৃত্যুযন্ত্রটার দিকে এই প্রথম আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চেয়েছি—এমনটা তো নয়! কাজেই ওই মেশিনটার বীভৎসতা সম্বন্ধে আপনাদের হঠাৎ জেগে ওঠা বিতৃষ্ণা আমাদের কাছে একটু আশ্চর্যজনক তো ঠেকবেই। তাহলে উপায়? শুনে রাখো সাধারণ মানুষের পাল, এই ভাবনার পরিবর্তন কিন্তু তোমাদের মূল্যবান জীবনের জন্য মোটেও নয়। আমরা মৃত্যুদণ্ড রহিতের কথা চিন্তা করছি আমাদের নিজেদের কথা মাথায় রেখেই। আজ যারা ডেপুটি আগামীকাল তাঁরা যে পূর্ণমন্ত্রী হবেন না এমন কথা কি কেউ বলতে পারে? সুতরাং আমরা চাই না যে গিলোটিনের ধারালো দাঁত উচ্চবর্ণের মানুষদের শরীরে কামড় বসাক। আমরা তাহলে ওটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেবো। তাতে যদি সকলেরই উপকার হয় তাও না হয় মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আমরা শুধু আমাদের কথাই ভেবেছি। ইউকেলর্গ[৪]-এর বাড়িটায় আগুন লেগেছে। তাই আগুন আমাদের নেভাতে হবেই। এবং খুব

BanglaBook.org

তাড়াতাড়ি, এক্ষুণি ঘাতকটাকে বরখাস্ত করো আর আইনের বই থেকে ধারাটাকে কেটে বাদ দাও।

এভাবেই সংকীর্ণ স্বার্থপরতা প্রবেশাধিকার পেয়ে মহৎ এক সামাজিক উদ্দেশ্যকে বিষিয়ে তোলে। সাদা মার্বেল পাথরের ওপর এটা যেন একটা আড়াআড়ি কালো দাগ। ওটাকে নষ্ট করতে চেয়ে যেখানেই তুমি ছেনি হাতুড়ি ঠোকো না কেন সেখানেই ওটা মাথা তুলবে। গোটা অবয়বটাকেই আবার তখন নতুন করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমরা সাধারণ মানুষেরা ওই চারজন মন্ত্রীকে হত্যা করা হোক তা কখনোই চাইনি। ওই হতভাগ্যরা যখন বন্দি হলেন তখন ওনাদের অভ্যুত্থান যত ঘৃণা ও ক্রোধকে উস্কানি দিয়েছিল প্রথমে তা সকলের মতো আমাদের মন থেকেও ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। বদলে ওনাদের উপর আমাদেরও করুণা হতে লাগলো। আমরা তখন ওঁদের সংস্কৃতির কথা ভেবেছিলাম যার মধ্যে ওনারা লালিত পালিত। আমরা ভেবেছিলাম ওঁদের নেতার কথা ও তাঁর দুর্বল মস্তিষ্কের কথা। কারাগারের স্যাঁতসেঁতে ছায়া যাকে খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো বানিয়ে দিয়েছিল। আমরা অবশ্য সমাজে ওনাদের বাধ্যবাধকতার কথা ভেবেছিলাম, ১৮২৯ সালের ৮ আগস্টে প্রচণ্ড খাড়াই পথে ছুটে নামতে নামতে হঠাৎ একদম থেমে যাওয়ার অসম্ভব চিন্তার কথাও, আর এতকাল ধরে রাজার প্রতিপত্তির ব্যাপারে প্রকৃত শক্তির কম মূল্য নিরুপণ করার কথা। এবং বিশেষ করে ওনাদের সম্ভ্রমের কথা যার ওপর ওনাদের মধ্যেই একজন দুর্ভাগ্যের লাল চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা অবশ্য সর্বান্তকরণে চেয়েছিলাম যে ওনাদের ক্ষমা করা হোক এবং তার জন্য যা মূল্য আমাদের দিতে হবে তাও দিতে আমরা রাজি ছিলাম তবু যদি এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি কোনোদিন ঘটতো এবং প্লেস দ্য গ্রীভ-এ ওনাদের হত্যা করার জন্য মঞ্চ তৈরি হতো—যদিও সেটা এক অলীক কল্পনামাত্র তবু আমাদের সুখস্বপ্নে বিভোর থাকতে দিন এই ভেবে যে—তাহলে সেইদিন, আমরা নিশ্চিত, ওই মঞ্চটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে একটা বিপ্লব হয়ে যেত। এই লেখক নিশ্চয়ই সেইদিন তথাকথিত সে বিপ্লবের এক সক্রিয় অংশীদার হতো। কারণ এটা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, সামাজিক সঙ্কটকালে সবরকম মৃত্যুদণ্ডের মধ্যে রাজনৈতিক মৃত্যুদণ্ডই হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ, সবচেয়ে ভয়ানক এবং সবচেয়ে ক্ষতিকারক। সুতরাং সেটার বিলুপ্তি ঘটানোটাও সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। অন্যথায় গিলোটিনের শেকড় পাথর ফাটিয়ে আরো গভীরে ঢুকে যাবে এবং অল্প দিনের মধ্যেই এর চারাগুলো মাটির নানান জায়গায় ফুটে বেরোতে শুরু করবে।

বিপ্লবের সময় যে মাথাগুলো কাটা পড়ে সেগুলোর থেকে সাবধান। কারণ সেগুলো জনসাধারণের ক্ষিদে মেটায়। সে কারণেই আমরা তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত ছিলাম পুরোপুরি মানবিক ও রাজনৈতিক কারণে—যারা চেয়েছিল ওই চারজন মন্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া হোক। এবং মৃত্যুদণ্ড রহিতের ব্যাপারে চ্যাম্বার অন্য কোনো সময় বেছে নিক এটা আমরা আরো বেশি করে চেয়েছিলাম।

একবার ভাবুন তো যে এই ভীষণভাবে কাম্য মৃত্যুদণ্ড রহিতের ব্যাপারটা তুঁলেরিস থেকে ভিন্সেনেস-এর জেলবন্দি চারজন সম্মানিত মন্ত্রীর পরিবর্তে যদি কোনো এক তথাকথিত সাধারণ অপরাধীর জীবনকে কেন্দ্র করে ঘটতো! যে অপরাধীর দিকে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আপনি ভুল করেও তাকাতেন না, যার সঙ্গে কথা বলতেও ঘৃণা বোধ করতেন, যার অপরিচ্ছন্ন দেহের ছোঁয়া আপনি সযত্নে এড়িয়ে চলতেন এমনই এক ভাগ্যাহত যার শৈশব ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরে খালি পায়ে ধুলো কাদার মধ্যে ছুটাছুটি করে কেটেছে, বাঁধের ধারে বসে হাড় হিম করা

BanglaBook.org

শীতে যে হি হি করে কেঁপেছে, খানিকটা উত্তাপ পাওয়ার লোভে যে মঁসিয়ে ভেফোর-এর রান্নাঘর থেকে নির্গত বাষ্পের দিকে লোভীর মতো খালি পেটে সারা সকাল চেয়ে থেকেছে যেখানে আপনারা খাওয়া-দাওয়া সারেন, আবর্জনা ফেলার জায়গায় কখনো কখনো একটুকরো রুটির সন্ধান পেয়ে যে নিজের পোশাকেই সেটাকে সন্তর্পণে মুছে নিয়েছে মুখে দেওয়ার আগে, অথবা একটা পেরেক দিয়ে সারাদিন নর্দমা ঘেঁটে গেছে যদি একটা পয়সা পাওয়া যায় সেই আশায় : যাদের আনন্দ বলতে ছিল শুধু রাজার জন্মদিনে নিখরচায় কিছু প্রদর্শনী দেখা। অবশ্য গ্রীভ-এর হত্যাকাণ্ডগুলোও নিখরচায় দেখানো হয়।

এইসব হতভাগারা যারা ক্ষিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে চুরি করে, তারপর ধীরে ধীরে আরো নীচ কাজ করতেও পিছপা হয় না। হৃদয়হীন সমাজের এইসব বঞ্চিত, চিরলাঞ্ছিত শিশুদের বারো থেকে আঠারো বছরের মধ্যে বয়স হলে রাখা হয় চরিত্র সংশোধনের জন্য একটা বাড়িতে; বয়স আঠারো বা তার ওপরে হলে রাখা হয় জেলে, আর চল্লিশে গিলোটিনের নিচে। এইসব ভাগ্যহতদের যাদের সত্যিই আপনারা ভালো করতে পারতেন, পাঠাতে পারতেন আর পাঁচজনের মতো স্কুল কিম্বা কারখানায়, কিন্তু এদের বাতিল জিনিসের মতো আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায়ের কথাই আপনাদের মনে আসেনি। তাই প্রথমে ওদের স্বাধীনতা হরণ করে ওদের ঢুকিয়ে দিয়েছেন তৌলুর লালরঙা উইটিবির অন্ধ কুঠুরিতে অথবা ওদের সযত্নে হত্যা করে ছুঁড়ে ফেলে দেন প্রাচীর ঘেরা ক্ল্যামার্ট-এর কবরস্থানে। ঠিক এইরকম একজন হতভাগ্যের জন্য যদি আপনারা মৃত্যুদণ্ড রহিতের প্রস্তাব করতেন তাহলে নিশ্চয়ই সেই অধিবেশন হতো অতি পবিত্র, রাজকীয়, মহান এবং সর্বসাধারণের অসীম শ্রদ্ধা পাওয়ার জন্য যোগ্যতম। অধিবেশনে আপনাদের কথাবার্তায় আশার আলো দেখা গিয়েছিল বলেই জমায়েতগুলো ঐশ্বরীয়, মহৎ ও ক্ষমাসুন্দর বলে মনে হয়েছে। এইসব অধিবেশনের গায়ে যেন মহানুভবতার তকমা বা লেবেল আটকানো ছিল। কারণ আপাতভাবে এগুলো নীচ ও দুর্বলদের রক্ষার উদ্দেশ্যেই ডাকা। এগুলো প্রশংসনীয় ছিল কারণ মনে হতো এ যেন দাক্ষিণাত্যের একদল শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের নীচ জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য লড়াই। এক্ষেত্রে ওই নীচ জাতি ছিল সাধারণ মানুষ ও তাদের শুভাশুভ। এদের জন্যে মৃত্যুদণ্ড রহিত করার তর্কের আড়ালে আপনারা একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন করার চেষ্টা করেছেন এবং একই সঙ্গে আপনাদের নিজস্ব কুঠারগুলোকে আরো শাণিত করার চেষ্টাও করেছেন। বলা বাহুল্য যে সাধারণের হিতার্থে আপনারা মৃত্যুদণ্ড রদ করার চেষ্টা একেবারেই করেন নি। করেছেন ওই চারজন মন্ত্রীকে রক্ষা করার রাজনৈতিক তাগিদে যাঁরা অভ্যুত্থান ঘটাতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছিলেন। কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হলো না।

তাহলে হলোটা কী? যেহেতু আপনাদের প্রচেষ্টা সদর্থক ছিল না সেহেতু সন্দেহের জন্ম হলো। এবং জনসাধারণ যখন আপনাদের এই চালাকিটা ধরতে পারলো তখন তারা এই প্রস্তাবের ভীষণরকম বিরোধিতা করলো আর অবিশ্বাস্যভাবে মৃত্যুদণ্ডের সপক্ষে নিজেদের রায় দিল যাতে বেশি ক্ষতি যদিও তাদেরই। আপনাদের বোকামো তাদের এই জায়গায় এনে দাঁড় করালো। অসাধুভাবে, অপ্রত্যক্ষভাবে, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আপনাদের এই প্রস্তাব রাখার কারণে গোটা ব্যাপারটাই অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতেও বিপদগ্রস্ত হয়েই ঝুলে থাকলো। আপনারা কাঁচা খেলোয়াড়! তাই সবাই আপনাদের দুয়ো দিয়েছিল।

তবু কিছু লোক তো ছিল যাদের এই তামাশাটাকে সত্যি ভেবে নেওয়ার জন্য কুপরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এই বিশাল অধিবেশন শেষ হতে না হতেই সিলস অব ইনটিগ্রিটি-র এক

BanglaBook.org

রক্ষক রাজার এটর্নিদের একটা ফরমান জারী করলেন এই মর্মে যে মৃত্যুদণ্ডের রায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবি রাখতে। এই দণ্ডের বিরুদ্ধে যারা ছিল তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। কিন্তু তাদের এই নিশ্চিন্ততা খুবই স্বল্পায়ু ছিল।

মন্ত্রীদের বিচার শেষ হলো। হয়তো কিছু রায়ও দেওয়া হলো। ফলত বেঁচে গেল চার মন্ত্রীর মহামূল্য জীবন। কিন্তু ওনাদের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে সমঝোতা হিসেবে ফোর্ট্রেস অব হ্যাম-কে বেছে নেওয়া হলো। এসব নানান বন্দোবস্ত করার ফাঁকে রাষ্ট্রনায়কদের মন থেকে শুধু যে ভয়ই মুছে গেল তা নয়, মুছে গেল মানবিকতার শেষ চিহ্নটুকুও। সুতরাং এই সর্বোচ্চ দণ্ড রহিত করার ব্যাপারে আর কোনো উচ্চবাচ্য শোনা গেল না, আর বড় বড় লোকেদের বন্দি করার ব্যাপারটাও উঠে গেল। অলীক ভাবনারা ফিরে এলো অলীক ভাবনা হিসেবেই রয়ে যেতে। তত্ত্বগুলো তত্ত্ব হিসেবেই রয়ে গেল আর কবিতা কবিতা হিসেবেই।

তবু গরাদের আড়ালে কিছু হাতে গোনা মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত সাধারণ অপরাধীও তো ছিল যারা গত পাঁচ ছ'মাস ধরে জেল চত্বরে খোলা মনে শারীরিক কসরৎ করতো, নিবিড় স্বস্তিতে টেনে নিতো মুক্ত বাতাস। ভবিষ্যতের ভাবনা আর ওদের বুকে পাথরের মতো চেপে বসতো না বলে ওরা ধরেই নিয়েছিল যে ওদের জীবন নিরাপদ। আর তাই এই বিলম্বিত কারাবাসকে ওরা প্রায় ক্ষমা বলেই ধরে নিয়েছিল। তাহলে একটু অপেক্ষা করে দেখুন কী হয়!

ওদিকে, সত্যিকথা বলতে কি ঘাতকটাও এক ভীষণ ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল। যেদিন থেকে সে আইনজ্ঞদের মানবতা, পর-হিতৈষণা ও প্রগতির কথা বলতে শুনেছিল সেদিন থেকেই সে ভাবতে শুরু করেছিল যে এবার তার খেল খতম। এস্ত ঘাতকটি তখন সকলের চোখের আড়ালে গিলোটিনের নিচে আশ্রয় নিয়েছিল। তার অবস্থা তখন জুলাই মাসের সূর্যের মতো নয়, হয়ে গিয়েছিল দিনের আলোতে এক রাতচড়া পাখির মতো। সে আশা পোষণ করেছিল যে হয়তো সে সকলের নজর এড়াতে সক্ষম হবে। তাই কানে আঙুল চেপে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে দিন কাটাচ্ছিল এক ভয়ংকর উদ্বেগে। দীর্ঘ ছ'টা মাস তার টিকিটাও দেখা যায়নি। সে যে বেঁচে আছে এ কথাটাই সে কাউকে জানতে দিতে চায়নি, ধীরে ধীরে অন্ধকার জীবনেই সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর দিনের পর দিন চ্যাম্বার-এর দিকে কান খাড়া রেখেও সে তার নাম উচ্চারিত হতে শুনলো না। অথবা আর শুনতে পেলো না সেইসব মহানুভবতার কথা যা তাকে অতিশয় ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। ট্রিটিস অন ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট সম্পর্কেও টেবিল চাপড়ে মহান সব বক্তৃতার বাণীও আর তার কানে এলো না। যদিও অন্যান্য অনেক কিছু সে সেখানে আলোচিত হতে শুনেছিল। সেসব ভীষণ প্রয়োজনীয় সামাজিক সব সমস্যার কথা, যেমন একটা রাস্তা তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা, অপেরা-কমিককে অনুদান দেওয়ার কথা, ফোলানো ফাঁপানো পনেরশো মিলিয়ন বাজেট বরাদ্দ থেকে এক লক্ষ ফ্রাঙ্কস্ সরিয়ে রাখার কথা। তার কথা কিন্তু কেউ ভাবনাতেও আনেনি, যদিও সে-ই ছিল ঘাতক। সুতরাং ভয় দূর হতেই সে তার গর্ত থেকে মাথা তুললো, চারপাশে তাকালো এক পা সে এগোল, তারপর আরো এক পা—যেন লা ফন্টেন-এর একটা ইঁদুর। এরপর ধীরে ধীরে সে পুরোপুরি গিলোটিন-মঞ্চের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে ওপরে উঠে হত্যা-মেশিনটাকে আদর করার ভঙ্গিতে নরম হাতে ঝাড়া মোছা ও পালিশ করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করল। এরপর সে অব্যবহারের কারণে মেশিনটার গায়ে যত জং টং পড়েছিল তা পরিষ্কার করে খাঁড়া বা ব্লেড নেমে আসার চ্যানেলটাকে মোম ঘষে ঘষে মসৃণ করার পর

BanglaBook.org

পরীক্ষা করেছিল যে সেটা সম্পূর্ণভাবে আবার ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে কি না। তারপর হঠাৎই সে লাট্টুর মতো পাক খেয়ে নিচে নেমে, যেসব বন্দিরা ভেবেছিল যে তাদের মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, তাদেরই মধ্যে থেকে একজনকে তার চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে, তাকে পেড়ে ফেলে, নগ্ন করে, হাত পা বেঁধে গিলোটিনের নিচে শুইয়ে দিতেই হত্যালীলা আবার মহা সমারোহে শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এইসব ঘটনা বর্ণনা করা যদিও অতি ভয়ানক তবু এর সবটুকুই ভীষণভাবে ঐতিহাসিক সত্য।

হ্যাঁ, এইসব ভাগ্যহত বন্দিদের ছ'মাসের জন্য প্রলম্বিত এক নতুন জীবন দান করা হয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে ওদের মানসিক নির্যাতন আরো বহুগুণ বাড়লো বই কমলো না। তারপর একদিন হঠাৎই কোনো কারণ না দর্শিয়ে ওপরওয়ালাদের মন যেমন চাইলো সেভাবেই মৃত্যুদণ্ডাদেশ আবার নতুন করে চালু করা হলো। ফলে হতভাগ্য মানুষ নামে সেই জীবগুলো আবার নিয়মমাফিক ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে থাকলো। ঈশ্বর অবশ্যই মহান! কিন্তু সবিনয়ে একটা কথা কি জিজ্ঞাসা করা যায় না যে ওই গুটিকতক মানুষকে বেঁচে থাকার অনুমতি দিলে কতখানিই বা আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি হতো? ফ্রান্সে কি বাতাস এতটাই কমে গিয়েছিল যে সকলে একসঙ্গে প্রশ্বাসটুকুও টানতে পারতো না?

যদি বিচারশালার কোনো নগণ্য কেরাণী, যার কাছে এই সর্বোচ্চ দণ্ড থাকুক বা উঠে যাক কোনোকিছুতেই কিছু যায় আসে না, তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেও থাকে—'ঠিকই তো, মৃত্যুদণ্ডটা এখন যখন আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নয় তখন গিলোটিনটাকে তো আমরা আবার চালু করতেই পারি'—তাহলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে তার হৃদয়ের মধ্যে কিছু একটা ঘৃণ্য ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল।

উপরন্তু এটা পরিষ্কারভাবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে জুলাই মাসের স্থগিতাদেশ যখন বাতিল করা হলো তারপর থেকে এমন নির্মম নিষ্ঠুর হত্যালীলা আগে কখনো দেখা যায়নি। লা গ্রীভ থেকে এত শিহরণ জাগানো হত্যাকাণ্ডের কাহিনী আগে কখনো শোনা যায়নি। আর মৃত্যুদণ্ডকে এত ঘৃণ্যও আর কখনো মনে হয়নি। যে মানুষগুলো রক্তের অক্ষরে আবার আইনের বাতিল ধারাটাকে পুনর্বাসন দিয়েছিল ক্রমবর্ধমান রক্তের পিপাসা মেটাবার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা, লজ্জা ও ক্ষোভের পাহাড় মাথা উঁচু করে উঠেছিল। ওদের কৃতকর্মের জন্য ওরা নিজেরাই যদি শাস্তি পায় তাহলেই হয়তো ভালো হবে।

কি নিষ্ঠুর নির্মমতার সঙ্গে হত্যালীলা সংঘটিত হতো তার দু-তিনটে উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন। রাজার অ্যাটর্নিদের স্ত্রীরা অন্তত হয়তো সেই বিবরণ শুনলে বিপর্যস্ত বোধ করবেন। অনেক ক্ষেত্রেই তো নারীদের বিবেকের সন্ধান আমরা পাই বা পেয়ে থাকি।

যদিও জায়গাটা, দিনটা বা অপরাধীর নামটা সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহের অবকাশ আছে, তবে তা নিয়ে কেউ তর্ক জুড়লে সমস্ত তথ্য প্রমাণ তাকে দেওয়া যেতেই পারে। সে যাই হোক, গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রান্সের দক্ষিণে, বোধহয় পামিয়ার্সেই হবে, জেলখানা থেকে এক বন্দিকে তলব করা হয়েছিল। লোকটা তখন নিশ্চিন্ত মনে তাস খেলছিল। ওরা যখন তাকে জানালো যে আর দু'ঘণ্টার মধ্যে তাকে হত্যা করা হবে তখন তা শুনেই তার এমন কাঁপুনি শুরু হয়েছিল যা আর থামছিল না। কারণ দীর্ঘ ছ'মাস মৃত্যুভয় ভুলে থাকার পর সে আর মরতেই চাইছিল না। তবু তার চুলটুল কেটে দেওয়া হলো, পিছমোড়া করে বাঁধা হলো এবং যাজকের কাছে পাপ স্বীকার করানোও হলো। তারপর চারজন সশস্ত্র পুলিশ পাহাড়ায় তাকে একটা গাধার পিঠে

BanglaBook.org

চড়িয়ে সমবেত জনতার মাঝখান দিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যামঞ্চে তোলা হলো। এ পর্যন্ত যা হলো অবশ্যই তা নিয়মমাফিক। হত্যামঞ্চে যাজকের হাত থেকে ঘাতক তার ভার নিলো। এবার তাকে হাড়িকাঠের মতো জায়গাটায় শোয়ানো হলো। খারাপ ভাষায়, তাকে কড়াইয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো এবং গিলোটিনের খাঁড়া বা ইস্পাতের ব্লেডটা চালু করে দিতেই তিনকোনা, ভারী সেই ব্লেডটা চ্যানেল বেয়ে নেমে এসে লোকটার গলনালী ছুঁয়ে স্থির হয়ে গেল। এবার অভাবনীয় এক কাহিনী শোনার জন্য প্রস্তুত হোন। ব্লেডটা লোকটার গলাটা কাটলো বটে তবে সবটা নয়, লোকটা বেঁচেই রইলো। তার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে বুকের রক্ত জমাট করা এক তীব্র আর্তনাদ ছুটে এলো। ঘাতকের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। আর সে ভারী ব্লেডটাকে ওপরে উঠিয়ে ছেড়ে দিল। ব্লেডটা দণ্ডিত মানুষটার গলায় আবার কামড় বসালেও মাথাটাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলো না। আহত অপরাধীটির তীব্র আর্তনাদে আবার আকাশ বাতাস ভরে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে রক্তপিপাসু জনতাও পৈশাচিক উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো। ঘাতক আবার ব্লেডটাকে ওপরে তুলে পুনরায় ছেড়ে দিল এই ভেবে যে তিনবারের বার সে নিশ্চয়ই সফল হবে। কিন্তু নাহ্, তৃতীয়বারের খাঁড়ার ঘা অপরাধীর গলার অন্য আরেক জায়গা থেকে রক্তের ফিনকি ছোটালেও তার মাথাটা ঘাড়ে ঝুলেই রইলো। এবার ঘটনাটা সংক্ষেপিত করা যাক মোট পাঁচ পাঁচবার সেই ব্লেড ওপরে উঠে আবার সবেগে নেমে এসেছিল এবং পাঁচবারই মানুষটার গলার নতুন নতুন জায়গা থেকে রক্তের ফিনকি ছুটে চারপাশ ভিজিয়ে দিয়েছিল। পাঁচবারই সুতীব্র যন্ত্রণায় তার আকুল আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল। লটপট করে একপাশে ঝুলতে থাকা মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তবুও সে ক্রমাগত গোঙাতে গোঙাতে বলেই চলছিল যে তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক। এইবার কিন্তু জমা মানুষের দল প্রচণ্ড বিবমিষায় হাতে হাতে পাথর তুলে নিয়েছিল। ওরা চেয়েছিল ঘাতকটিকে সমুচিত শাস্তি দিতে। আর তাই দেখে সে প্রাণভয়ে লাফ দিয়ে পড়েছিল গিলোটিনের নিচে আর তারপর লুকিয়েছিল মাউন্টেড পুলিশের আড়ালে। কিন্তু শেষটুকু তো আপনারা এখনো শোনেন নি।

হত্যামঞ্চে তখন অপরাধীটি একা। কোনোরকমে সে তার রক্তে ভেজা দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার প্রায় অর্ধেক কাটা মাথাটা একপাশে ঘাড়ের ওপর ঝুলছে। তবু সেই অবস্থাতেও সে কোনোমতে মুক্তি প্রার্থনা করেই চলেছিল। এতক্ষণে আপামর জনতার বুঝিবা দয়া হলো। ওরা পুলিশের বেড়াজাল ঠেলে হতভাগ্য মানুষটার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে চাইলো। ঠিক সেই সময় ঘাতকের এক সহকারী বড় জোড় বছর কুড়ি হবে যার বয়স, মঞ্চে উঠে এসে অপরাধীটিকে ঘুরে দাঁড়াতে বললো তার বাঁধন খুলে দেবে বলে। হতভাগ্য লোকটি সেই অবস্থাতেও কোনোমতে ঘুরে দাঁড়াতেই ছেলেটি তার কাঁধে লাফিয়ে উঠে কষাইয়ের মাংস-কাটা ছুরি দিয়ে গলাটার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটুকু পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেটে দিল। হ্যাঁ, ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছিল। সাহস থাকে তো ঘটনাটা অস্বীকার করে দেখান!

আইন মোতাবেক, একজন জজ সাহেব নিশ্চয়ই এই হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী আছেন! তাঁর অঙ্গুলি নির্দেশে এই শেষটুকু অবশ্যই বন্ধ করা যেতো। কিন্তু সেই ভদ্রলোক তখন তাঁর আরামপ্রদ জুরিগাড়িতে বসে করছিলেন-টা কী যখন অন্য একজন লোক দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীটিকে মাংস-কাটা ছুরি দিয়ে কাটছিল? তাঁরই চোখের সামনে, তাঁরই ঘোড়ার নাকের ডগায়, তাঁরই জুরিগাড়ির জানলার খুব কাছেই যখন এই খুনীগুলো প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যালীলায় মেতে উঠেছিল তখন মহানুভব কোন দিকে তাকিয়ে ছিলেন?

BanglaBook.org

কিন্তু এই জজের বিচার হয়নি। হয়নি সেই ঘাতকেরও। ঈশ্বর সৃষ্ট একটি মানুষকে শাস্তি দিতে গিয়ে অন্য মানুষেরা কেমন করে তাদের নিজেদেরই তৈরি সমস্ত মানবিক আইনকে দানবীয় নির্মমতায় অনুলঙ্ঘন করলো তা খুঁজে বের করার জন্য কোনো তদন্ত কমিশনও গঠিত হয়নি।

সতেরোশ শতকটাকে বা রিসলিও এবং ক্রিস্তভ ফুঁকেত-এর সময়টাকে ফৌজদারি আইনের কালো যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়। এই সময়ে দ্য বৌফ্যা নন্টস্ এবং সামনে মঁসিয়ে দ্য স্যালে-কে হত্যা করা হয়। যে অদক্ষ সৈনিকটি তাঁকে হত্যা করে সে কিন্তু কাজটা তলোয়ারের এক কোপে সারতে পারেনি। উল্টো কুপার্স এজ দিয়ে বত্রিশবারের প্রচেষ্টায় তাঁকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারতে কোনোমতে সক্ষম হয়েছিল। কাজটা যে আদৌ ঠিক হয়নি সেকথা বুঝতে পেরে লজ্জায় অধোবদন হয়েছিল পার্লামেন্টের সমস্ত সদস্যরা। গঠিত হয়েছিল একটা তদন্ত কমিশন। রিসলিও-এর যদিও কোনো শাস্তি হয়নি তবে সেই সৈনিকটির শাস্তি হয়েছিল। কোনো সন্দেহ নেই যে এটাও একটা ভুল তবু বিচারের প্রবণতার একটু আভাস তো মিলেছিল।

কিন্তু এক্ষেত্রে তো কিছুই হলো না! ঘটনাটা যদিও ঘটেছিল জুলাই মাসের ঠিক পরে পরেই, সময়টা যখন ছিল প্রগতির হাওয়ায় আইন মেনে চলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এবং মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষে মন্ত্রীসভার সেই বহুল প্রচারিত বিবেকের কথা বলার ঠিক এক বছরের মধ্যেই। অথচ তবুও এতবড় ঘটনাটা সকলেরই নজর এড়িয়ে গেল। প্যারিসের খবরের কাগজগুলো লিখলো যে ঘটনাটা সন্দেহজনকভাবে সত্যি হলেও হতে পারে। কাউকে অভিযুক্ত করা হলো না। তিরস্কার করা হলো না। বরং লেখা হলো যে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ গিলোটিনটাকে নষ্ট করতে চেয়েছে যাতে ঘাতককে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়। হয়তো ঘাতক তার কোনো অধস্তন কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছিল, তাই প্রতিশোধ স্পৃহায় সেই কর্মচারীটি এমনতর কাণ্ডটা ঘটিয়েছিল।

বাহ্ বাহ্, ঘটনাটা তাহলে এরকম মজার ছিল! বেশ তাই না হয় হল। তাহলে আসুন আর একটা ঘটনার কথা শোনা যাক।

মাত্র তিনমাস আগে, ডিজোঁ-এ এক মহিলাকে গিলোটিনের নিচে শোয়ানো হয়েছিল তার কৃতকর্মের জন্য (একজন নারী!)। আবারও ড. গিলোটিন-এর ইস্পাতের খাঁড়াটা ঠিকঠাক কাজ করতে পারলো না। মহিলাটির মাথাটা সম্পূর্ণ কাটা পড়লো না। সুতরাং ঘাতকের সহকারীরা তার পা দুটোকে চেপে ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সজোরে টানতে লাগলো। যন্ত্রণার আক্ষেপে নারীটি তখন পাগলিনীর মতো চিৎকার করছে। অবশেষে ওরা টানতে টানতেই তার ধড় থেকে মুণ্ডটা আলাদা করতে সক্ষম হলো।

এভাবেই আমরা প্যারিসে, পুনরায় গোপন হত্যার দিনগুলোর মধ্যে ফিরে এসেছিলাম। জুলাই মাসের পর থেকে ওরা অবশ্য বেদম ভয়ে প্লেস দ্য গ্রীভ-এ কোনো অপরাধীর মাথা কাটতে সাহস করেনি। সেজন্যই এই গোপন হত্যালীলা। এই তো মাত্র ক'দিন আগে দেশান্দ্রিও নামেরই বোধহয় এক কয়েদীকে বিসেত্রে থেকে বের করে ওরা একটা বাক্সর মতো দেখতে দু-চাকার গাড়িতে চাপালো। বাক্সটাতে কোনো জানালার নাম গন্ধ ছিল না। ওরা সেটাতে ছিটকিনি ও তালা লাগিয়ে দিল। একজন কারারক্ষী পুলিশ সামনে ও একজন পিছনে ছিল। গাড়িটা তারপর এমনভাবে চলে যেতে থাকলো যাতে কোনো লোকই কিছু বুঝতে না পারে। চালানি মালটাকে ওরা ডেলিভারি দিল শহরের জনহীন শেষ প্রান্ত ব্যারিয়েন সঁ জ্যাক-এ। দিনের প্রথম

BanglaBook.org

ভাগে অর্থাৎ সকাল আটটা নাগাদ যখন ওরা সেখানে পৌঁছালো তখন সেখানে কয়েদীটার জন্য অপেক্ষা করছিল একটা ঝকঝকে নতুন গিলোটিন। লুকিয়ে তৈরি করা সেই হত্যামঞ্চের কাছে তখন দর্শক বলতে ১০/১২টি বালক যারা স্তূপীকৃত পাথরের টুকরোর ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। কয়েদীটাকে খুব তাড়াতাড়ি বাক্সটা থেকে টেনে হিঁচড়ে বার করা হলো। এরপর ওকে প্রাণভরে বাতাসটুকুও টানার সময় না দিয়ে ওরা ওর মাথাটা চোরের মতো লজ্জাজনকভাবে কেটে দিল। এটাকেই নাকি বলে সর্বোচ্চ বিচারব্যবস্থার বৈধ শাস্তি যা সর্বসমক্ষে অপরাধীদের দেওয়া হয়। ওফ্, কী হীন প্রহসন!

রাজার বিচার তাহলে কীভাবে সভ্যতা কথাটার অর্থপ্রকাশ করবে? আমরা আর কত নীচে নামতে পারি? তাহলে কি বলা যায় যে বিচার ব্যবস্থা একটা ধাপ্পাবাজি? লোকের চোখকে শুধু ফাঁকি দেওয়ার জন্য? আইন কি তাহলে স্বার্থসাধনের সুবিধার ওপর নির্ভরশীল? ওফ্, কি ভয়ানক!

একজন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী কি এতই ভয়ংকর এক জীব যে সমাজের তার সঙ্গে এইরকম ধূর্ত বিশ্বাসঘাতকতা করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই?

যদিও সততা বজায় রাখতে গেলে এটা লেখা প্রয়োজন যে এইরকম হত্যা অবশ্য সমস্তটাই গোপনে করা হতো না। হত্যার দিন সকালে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঢেঁড়া পিটিয়ে সকলকে জানানো হতো অবশ্য। মনে হয় এই খবর বিক্রি করেও কিছু লোক তাদের জীবিকা অর্জন করতো। আপনারা কি বুঝতে পারছেন? একজন হতভাগ্য মানুষের অপরাধ, তার শাস্তি, তার নির্যাতন, আর তার জীবনের শেষ ক'টি মুহূর্ত এখানে পণ্যে রূপান্তরিত—একটা খবরের কাগজ—যা এক সউ-এর বিনিময়ে কেনা যায়। রক্তে ভেজা পিছল ওই একটি মুদ্রার চেয়ে আর কোনো কিছু কি ওটার চেয়েও ভয়ংকর হতে পারে? কে নিচু হয়ে তুলে নেবে ওই মুদ্রা?

আমরা অনেক উদাহরণ দিয়েছি। হয়তো বা প্রয়োজনের তুলনায় বেশিই। ওগুলো কি সত্যিই রোমহর্ষক নয়? এবার বলুন মৃত্যুদণ্ডের সপক্ষে আপনাদের কী বলার আছে?

ঠিক আছে, আমরা একে একে প্রশ্ন করছি। আপনারা উত্তর দিন, প্রথম ফৌজদারি মামলার জুরি মহোদয়দের। না পণ্ডিত মানুষদের নয়। আমরা জানি যে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা মৃত্যুদণ্ডের সপক্ষে রায় দেন কারণ অন্যান্য সেইসব বিষয়ের মতো এ ব্যাপারেও যে তর্ক বিতর্কের অবকাশ আছে। অপরপক্ষে আরো কিছু মানুষ আছেন যাঁরা মৃত্যুদণ্ডের সপক্ষে রায় দেন কারণ কিছু মানুষ এর বিপক্ষে বলে। এই শেষোক্ত দলটিতে রয়েছে হিংসুটে উপগ্রহেরা। আইন বিশারদদের ঘিরে থাকতে তাদের ঠিক তেমনি করে প্রায়শই দেখা যায় যেমন করে মহান শিল্পীদের চারপাশে তাঁদের অনুচরেরা ঘিরে থাকে। দ্য জোসেফ গ্রীপাসদের যেমন ফিলানজিয়ারির থেকে আলাদা করা যায় না। মাইকেল এঞ্জেলোর থেকে যেমন টোরেজিয়ানিদের অথবা স্কুডারিজকে কর্নেলিসদের থেকে।

এসব লোকগুলোর কথা অবশ্য আমরা বলছি না। আমরা বলছি সেইসব লোকেদের কথা যারা সত্যিই আইনবেত্তা, সত্যিই তার্কিক, সত্যিই চিন্তাবিদ এবং সেইসব লোকেদের যারা মৃত্যুদণ্ডের জন্যই মৃত্যুদণ্ড ভালোবাসে, ভালোবাসে এর নিষ্ঠুর সৌন্দর্য্যের জন্য, এর ক্ষমাশীলতার জন্য, এর সৌকুমার্য্যের জন্য।

এইসব মানুষেরা কি এর সারবত্তা সম্পর্কে কিছু বলবেন?

যারা বিচার করেন ও এই সর্বোচ্চ দণ্ডদান করেন তাঁরা বলেন এটা নাকি জরুরি। কারণ প্রথমত এইরকম একজন অসামাজিক মানুষকে সমাজ থেকে নির্মূল করা প্রয়োজন। তা না

BanglaBook.org

হলে সে সামাজিক ক্ষতি সাধন করতেই থাকবে—বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে। অন্তত সেরকম সম্ভাবনা তো থেকেই যায়। কিন্তু এটাই যদি শেষ কথা হয় তাহলে তো যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই অনেক হত্যা কেন? এই যুক্তিকে আপনারা খণ্ডন করবেন এই বলে যে কয়েদীরা তো জেল ভেঙেও পালায়। তাই যদি হয় তাহলে ওদের ওপর আরো ভালো করে পাহারা দেওয়ার বন্দোবস্ত করুন! যদি লোহার গরাদকেও আপনারা বিশ্বাস করতে না পারেন তাহলে বন্য প্রাণীদের আপনারা গরাদের আড়ালে রেখেছেন কী করে? কারারক্ষীরা যদি নিপুণ হয় তাহলে ঘাতকের প্রয়োজনীয়তাটা কোথায়?

দ্বিতীয়ত আপনারা যুক্তি দেখান—'সমাজ তো প্রতিশোধ নেবেই। সুতরাং শাস্তিও অনিবার্য।' দুটি ক্ষেত্রেই এই যুক্তি ভুল। কারণ প্রতিশোধ নেয় মানুষ। আর শাস্তি দেন ঈশ্বর।

এই দুইয়ের মধ্যেই তো সমাজের অবস্থান। শাস্তির অবস্থান অনেক উঁচুতে আর প্রতিশোধের স্থান তো তার থেকে অনেক অনেক নীচে। তাই এত মহান আর এত ক্ষুদ্রতার সঙ্গে সমাজের সহবাস বাস্তবিক পক্ষে অসম্ভবই বলা চলে, প্রতিশোধ স্পৃহার বদলে আমাদের তাই সংশোধনের চেষ্টার মাধ্যমে উন্নতি বিধানের উপায় খোঁজা উচিত। অপরাধবেত্তার অনুশাসনকে যদি এই দিক থেকে বিচার করা হয় তাহলে হয়তো সবাই তা বুঝবে ও তাকে সমর্থনও করবে।

কিন্তু আপনাদের তৃতীয় ও সর্বশেষ যুক্তি হলো আদর্শ শাস্তির তত্ত্ব 'আমাদের একটা উদাহরণ সৃষ্টি করা উচিত! অপরাধীদের জন্য যে শাস্তি অপেক্ষা করে আছে তা ভেবে যেন অন্য অপরাধপ্রবণ মন নীচ কাজ করা থেকে বিরত থাকে!' সনাতন প্রসঙ্গটির মূল কথাও মোটামুটি একই প্রকার। ফ্রান্সের পাঁচশো আদালতও এই বিষয়ের ওপর একই ভাষায় অপরাধী সাব্যস্ত করণের ও শাস্তিদানের কথাই বলেছে। হয়তো কোনো ক্ষেত্রে সেটা খুব জোরালো ভাষায় অথবা কখনো কিছুটা নরমভাবে।

সে যাই হোক, উদাহরণ সৃষ্টির ব্যাপারটা আমাদের ঠিক মাথায় ঢুকছে না। আমরা তো এই নিয়ে তর্কও করি যে জনসমক্ষে শাস্তিদানও সেরসময়ে ঠিকঠাক ফলপ্রসূ হয় না, বরং সাধারণ মানুষদের শিক্ষিত করে তোলার বদলে তাদের আরো চরিত্রভ্রষ্ট করে ও তাদের মধ্যেকার সুকুমার প্রবৃত্তিগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে নাগরিক সৎগুণগুলোকেও তা শেষ করে দেয়। এর সপক্ষে অনেক প্রমাণ তো আমাদের হাতের কাছেই আছে। তাই সেগুলোর পুনরায় উত্থাপন তর্কসাপেক্ষ বিষয়টিকে শুধু ভারাক্রান্তই করবে। এইসব হাজারো উদাহরণের মধ্য থেকে একটার কথা বলা চলতেই পারে, কারণ ঘটনাটা ঘটেছিল এই লেখা শুরুর মাত্র দিনদশেক আগে। সেন্ট পল-এ লুই ক্যামাস নামে একজন অগ্নিসংযোগকারীকে হত্যার অব্যবহিত পরেই মুখোসধারী একদল মানুষ হত্যামঞ্চের চারপাশ ঘিরে নাচতে শুরু করেছিল। এভাবেই কি উদাহরণ সৃষ্ট হয়! পুণ্য উৎসবের শেষদিনে অংশগ্রহণকারী কিছু জনতা এভাবেই আপনাদের মুখের ওপর হেসেছিল!

এতসব সত্ত্বেও যদি আপনারা আপনাদের সেই সামান্য উদাহরণ তৈরির সপক্ষে অনড় থাকেন তাহলে আমাদের ষোড়শ শতকে ফেরত পাঠিয়ে দিন, আমাদের ওপর আরো নৃশংস হয়ে উঠুন, যতভাবে পারেন আমাদের নিগৃহীত করুন, আমাদের ফারিনাসিয়াস[৬] দিন, আমাদের সর্বোচ্চ নির্যাতন দিন, আমাদের জন্যে হাড়িকাঠ সরবরাহ করুন, আগুনে পুড়িয়ে মারার জন্য শূলদণ্ড পুঁতুন, লঘুপাপে গুরু দণ্ড দিন, আমাদের ছাল ছাড়াবার ব্যবস্থা করুন, নাড়িভুঁড়ি টেনে বার করুন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো করুন, আমাদের জীবন্ত

BanglaBook.org

সমাধি দিন, কড়াইয়ে আমাদের জীবন্ত অবস্থায় সেদ্ধ করে মারুন। ফিরিয়ে আনুন ঘাতকের পণ্যশালার মতো আরো কয়েকটা দোকান প্যারিসের প্রধান প্রধান জায়গায় যেখানে নিয়মিত নরমাংসের যোগান আসতে থাকবে। মন্টফুঁকো-এর দিনগুলো ফিরিয়ে আনুন, সঙ্গে তার ষোলোটা পাথরের থাম, তার বিশাল ভিত্তিভূমি, সাদা হাড়ে ছাপাছাপি গুহাগুলো, তার বীম, হুক, চেইন, বাঁকাভাবে সাজানো কঙ্কালগুলো, সাদা ঢিপি আর তার ওপর বসে থাকা কালো কালো অসংখ্য কাক, ফাঁসিকাঠগুলো। আর সেই মৃতদেহের দুর্গন্ধ যা উত্তুরে ও পূবের হাওয়ার দমকে ভেসে এসে ভরিয়ে দেয় গোটা ফবর্গ দু টেম্পল। হ্যাঁ, প্যারিসের ঘাতকের আসুরিক গৌরবকে আবার তার পুরনো মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করুন। কেনই বা করবেন না? তাহলেই তো সত্যিকারের একটা উদাহরণের মতো উদাহরণ তৈরি হবে। তাহলেই তো যেমন অপরাধ তেমনি মানানসই হবে তার শাস্তি। মৃত্যুদণ্ড হবে তেমন করে যেমনটি হওয়া উচিত। এবং তা শুধু ভয়াবহ ব্যাপারই হবে না, হবে আতঙ্কের ব্যাপারও।

অন্যথায়, ইংল্যান্ডের প্রথাটাকেও চালু করা যেতে পারে। ওখানে ডোভার কোস্টে একজন চোরা চালানকারীকে বন্দি করার পর উদাহরণ সৃষ্টি করার জন্য তাকে ফাঁসিতে লটকানো হলো। এবং উদাহরণ সৃষ্টির জন্য তাকে মৃত্যুর পর ঝুলিয়েই রাখা হলো। খারাপ আবহাওয়া যাতে লাশটাকে পচাতে না পারে খুব তাড়াতাড়ি সেজন্য আলকাতরা মাখানো কাপড় দিয়ে সেটাকে যত্ন সহকারে জড়ানো হলো যাতে বারবার কাপড়ও না পাল্টাতে হয়। ওহো! কি মিতব্যয়ী দেশ, যে কিনা লাশের গায়েও আলকাতরা লাগায়!

তবু এই প্রক্রিয়াতে, অবশ্যই, কিছু যুক্তি আছে। কারণ এটাই বোধহয় 'উদাহরণযোগ্য শাস্তি-তত্ত্ব' বোঝানোর সবচেয়ে ভালো উপায়।

কিন্তু ভেবে দেখে বলুন তো, সত্যিই কি আপনারা উদাহরণের বুলি কপচিয়ে কিছু শেখাতে সমর্থ হচ্ছেন যখন আপনারাই কাপুরুষের মতো কোনো এক হতভাগ্যের কণ্ঠনালী কেটে দিতে তৎপর হচ্ছেন রাজপথের বদলে তাকে কোনো এক নির্জন স্থানে নিয়ে এসে? দিবালোকের লা গ্রীভ সম্বন্ধে অবশ্যই অনেক কিছু বলা যায়। কিন্তু নির্জন ব্যারিয়েন সঁ জ্যাক সম্বন্ধে! তাও আবার সকাল আটটায়! কে সেখানে তখন যায়? ক'টা লোক জায়গাটার কাছাকাছি থাকে? তাহলে এই উদাহরণ সৃষ্টির আয়োজন কার জন্য? বোধহয় রাজপথের দু-পাশে লাগানো সারি সারি গাছগুলোর জন্যে—তাই না?

আপনারা কি বুঝতে পারছেন না যে এইসব হত্যা জনসমক্ষে করার বদলে আপনারা লুকিয়ে চুরিয়ে করছেন? আপনারা আপনাদের অপকীর্তি যাতে কারো চোখে না পড়ে সেই চেষ্টা প্রাণপণে করে চলেছেন। তাহলে কি আপনারা আপনাদের কৃতকর্মের জন্য ভীত ও লজ্জিত? নইলে কাপুরুষের মতো ও দ্বিধাগ্রস্তভাবে আপনারা কেন কেউ যাতে শুনতে না পায় তেমনি বিড়বিড় করে বলছেন—'উদাহরণযোগ্য শাস্তি কাকে বলে সেটা দেখে শেখার কথা'? অর্থাৎ মনের গভীরে এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আপনাদেরও নিশ্চয়ই যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাই আপনাদের মতামতটা পর্যন্ত আপনারা জোরে বলতে ইতস্তত করছেন। আপনারা তো নিজেরাই নিশ্চিত নন যে আপনারা যা করে চলেছেন তা সঠিক কি না। আজ আপনারা তাই সর্বগ্রাসী এক সন্দেহের শিকার। তবু অজ্ঞানতাবশত রুটিনমাফিক আপনারা ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করেই চলেছেন। যদিও আপনারা জানেন না যে কি অপরাধ আপনারা প্রতিদিন করেই চলেছেন। অতি ভদ্র ভাষায় বলতে গেলে রক্তলোলুপতার জন্য আপনারা আপনাদের মানবিকতা ও সামাজিকতা বিসর্জন দিয়েছেন। আপনাদের

BanglaBook.org

পূর্বসূরীদের মতো আপনাদেরও মাথাগুলো রাতে ঘুমের মধ্যে কি প্রচণ্ড আক্ষেপে বালিশের ওপর এপাশ-ওপাশ করে না? আপনাদের আগেও বহু লোকই তো মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছে, তবে তারা নিজেদের কাজকে সম্পূর্ণ সঠিক বলে বিশ্বাস করতো। ওরা স্থির নিশ্চিত ছিল যে জনসাধারণের উপকারার্থেই ওরা এই কাজ করতো। কিন্তু আপনারা?

জোভেনাল দে আরসঁস-এর একজন জজ হিসাবে নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। ঠিক তেমনটাই ছিল এলি ডি থোরেট-এর। এমনকি লবারদমঁ, লা রেইন ও লা ফেমাস-দেরও স্থির বিশ্বাস ছিল যে তাঁরা হচ্ছেন এক একজন জজ। কিন্তু নিজেদের বুকে হাত দিয়ে আপনারা বলুন তো দেখি যে আপনারা খুনী নন, হত্যাকারী নন?

লা গ্রীভ-এর তুলনায় আপনারা বেশি পছন্দ করেন ব্যারিয়েন সঁ জ্যাক, জনসাধারণের তুলনায় বেশি ভালোবাসেন মরুভূমি, দিনের তুলনায় বেশি চান আলো আঁধারি ভোর। আপনারা যেটাই করেন সেটাই স্থির নিশ্চিত হয়ে করতে পারেন না। তাই জোর গলায় আমি বলতে পারছি যে আপনারা নিজেরাই নিজেদের লুকাচ্ছেন।

সুতরাং যেসব কারণের জন্য আপনারা মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখলেন তার সবটাই অপ্রমাণিত এবং তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ আপনাদের আইনের নীতিবাক্য আজ সমস্তটাই বিবস্ত্র। আপনাদের অপরাধীকরণের প্রক্রিয়া আজ একমুঠো ছাইয়ের চেয়ে বেশি দামি নয়। আপনাদের সমস্ত সারগর্ভহীন তথাকথিত ন্যায়ের কাছে সত্যিকার যুক্তির শেষ সংকেতটিও আজ মৃত্যুরই আরেক নাম।

তাই রাজার ন্যায়বিচার (!) আর আমাদের কাছে কি আশা করতে পারে যে আমরা আমাদের জীবন এক ডাহা মিথ্যা স্তোকবাক্যের জন্য বলি দিতে রাজি হবো যাতে নাকি উদাহরণ সৃষ্টি হতে পারে, সমাজ রক্ষা পেতে পারে এবং জনসাধারণের নীতিবোধ সুরক্ষিত থাকতে পারে? আহা! কি অপূর্ব সারগর্ভহীন আপনাদের বাগ্মিতা! সামান্য একটু পিনের খোঁচাতেই বাগ্মিতার বেলুন চুপসে শেষ। অপরাধীদের অনুগ্রহের পাত্র ভেবে আপনাদের বক্তৃতায় আপনাদের বাগ্মিতায় শুধু প্রকটভাবে দেখা যায় আপনাদের হৃদয়ের কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা, পা-চাটা মনোভাব আর অর্থলিপ্সার আকুলতা। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা, আপনারা মুখ খুলবেন না! কারণ আপনাদেরই জজের সিল্কের মতো নরম থাবার নিচে ঘাতকের শাণিত নখগুলো যে বড় দৃষ্টিকটুভাবে প্রকট!

রাজার কথা তো ছেড়েই দিলাম, রাজার এটর্নির ক্ষমতার কথাই কি ভেবে কুল পাওয়া যায়? এই লোকটি অন্যদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে তার জীবিকা অর্জন করে। প্লেস দ্য গ্রীভ-এ তোমার আমার অভিনয়ের অংশটুকু ওই ভদ্রলোকটিই তো ঠিক করে দেন। শুধু কি তাই? উনি হচ্ছেন এমন একজন ভদ্রলোক যাঁর নিজের বিদ্যাবত্তা, কৌলিন্য ও আচার ব্যবহার নিয়ে গর্বের শেষ নেই। অবশ্যই নিজেকে তিনি এক ভালো বক্তাও মনে করেন। কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে তিনি দু-চার লাইন ল্যাটিন কবিতাও পাঠ করেন যাতে তাঁর অথৈ জ্ঞান সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে। আর এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর নিজের অংশটুকু অভিনয় করতে গিয়ে প্রায়শই যে বাড়াবাড়ি করে ফেলেন না তাও নয়। তিনি তাঁর নির্লজ্জ আত্মম্ভরিতা ঠিক সেই সময় প্রকট করতে থাকেন যখন অন্যদের জীবনসংশয়। অবশ্য তাঁর নিজেরও রোল মডেল আছে। চিরকাল তাঁদেরই নকল করতে করতে যদিও তাঁর ঘেন্না ধরে গেছে। তবু উচ্চাশার কি কোনো শেষ আছে? কোর্টে বিচারের সময় তাঁর কাজ হচ্ছে গিলোটিনের সপক্ষে থাকা। কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করার সময় বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি এমন ভান দেখান যেন তাঁর বক্তৃতায় সাহিত্যই সমৃদ্ধ হচ্ছে।

BanglaBook.org

উপমা, কোটেশানের বন্যা বইয়ে দেন। এর পেছনে উদ্দেশ্য কি নেই? অবশ্যই আছে। আর তা হচ্ছে সমস্ত কোর্ট যেন তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে পারে—বিশেষ করে মেয়েরা।

তাঁর ঝুলিতে সচরাচর ব্যবহৃত কথার সংখ্যাও প্রচুর এবং সেগুলো তিনি কুশলী লেখক সুলভ ভঙ্গিমায় ও সুমার্জিত কথন প্রণালীতে ঠিক ততক্ষণই ব্যবহার করেন যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোকে তাঁর একান্ত নিজস্ব বলে মনে হয়। ভোঁতা পরিভাষা ব্যবহারে তাঁর অরুচি ঠিক ততটাই যতটা আমাদের বিয়োগান্ত কবি ডিলাইলের শিষ্যদের। সোজা কথাকে ঘুরিয়ে বলতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অন্তত অন্তর্নিহিত অর্থটা। কারণ সেইসব কথা যা সোজা ভাষায় বললে আপনাদের চমকে দিতে পারে সেগুলোকে তিনি বিশেষণের মোড়কে ভূষিত করে উপহার দিতে পারেন যে! তিনি মঁসিয়ে স্যামসন (ঘাতক)-কেও পর্যন্ত প্রদর্শনের উপযুক্ত করে তুলতে পারেন। তিনি গিলোটিনের ব্লেডের নির্মমতাকে পর্দার আড়ালে ঢেকে দিতে পারেন। সমস্ত ভয়ংকর ভয়াবহ জিনিসের ওপর কুয়াশার আস্তর ফেলতে পারেন। রক্তাক্ত বাক্সটাকে পর্যন্ত তিনি ঢেকে দেন মধুর শব্দের আড়ালে যাতে কেউ বুঝতেই না পারে যে ওটার মধ্যে কী আছে। আপনারা কি দেখতে পান না যে, রাতে পড়ার ঘরে বসে উনি কি নিবিড় মমতায় ওনার আগুন-ঝরা বক্তৃতার পাতাগুলোকে আদর করে চলেছেন যে বক্তৃতা কিনা ছ'সপ্তাহের মধ্যেই আবার একটা গিলোটিনকে তৈরি হতে বলবে? আপনারা কি দেখতে পান না যে কি কারণে নিবিড় অধ্যবসায়ে ওনার কপাল বেয়ে রক্তের ঘাম ঝরে? সে তো এক অপরাধীর শিরশ্ছেদ হবে বলে। আপনারা কি দেখতে পান না যে আইনের এক ভোঁতা ছুরি দিয়ে কেমন করে উনি ভাগ্যহীনদের কণ্ঠনালী ক্রমাগত পেঁচিয়েই চলেছেন? আপনারা কি দেখতে পান না যে কেমন করে কিছু এলোমেলো উপমাকে আর উদ্ধৃতিকে কথার বিষে ভিজিয়ে একটা মানুষের জীবনকে নিঙড়ে তাকে মেরে ফেলা হয়? এটা কি সত্যি নয় যে যখন তিনি লেখেন তখন তাঁর টেবিলের নিচে অন্ধকারে পায়ের কাছে গুঁড়ি মেরে বসে থাকে ঐ ঘাতকটা? যার জন্যে মাঝে মধ্যেই, এক প্রভু যেমন তার পোষা কুকুরকে বলে, তাঁকেও বলতে হয় 'চুপ করে বোস ব্যাটা, সময় হলে তোর জন্যে বরাদ্দ হাড়ের টুকরো তুই পাবি।'

ব্যক্তিগত জীবনে এই রাজভৃত্যটি হয়তো এক সম্মানীয় মানুষ, একজন স্নেহময় পিতা, ভালো ছেলে, সহমর্মী স্বামী, এবং নির্ভরযোগ্য বন্ধু। আর এই জায়গাটায় কোনো সন্দেহ থাকাটাই উচিত নয় কারণ এসব কথাই তো পির লাসেস সমাধিক্ষেত্রে পাথরের ফলকের পর ফলকের সারা দেহেই উৎকীর্ণ আছে!

ওফ্, সেদিন যেন আর বেশি দূরে না হয় যেদিন আইন এই ঘৃণ্য পেশাটাকে বিলুপ্ত করে দেবে। আমি নিশ্চিত যে, আমাদের সভ্যতার বাতাস আজ হোক কাল হোক, 'মৃত্যুদণ্ড' শব্দটাকে ক্ষইয়ে ফেলতে সমর্থ হবেই।

একেক সময় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে এই শাস্তির পক্ষে যারা তারা হয়তো সম্যকভাবে বোঝেই না যে মৃত্যুদণ্ড কীসের প্রতিনিধিত্ব করতে চায়। তবু দাঁড়িপাল্লার একদিকে পৃথিবীর সবচেয়ে নারকীয় ও জঘন্যতম অপরাধীকে রাখুন এবং অন্যদিকে সমস্ত অপূরণীয় শাস্তির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর মৃত্যুদণ্ডকে আর তারপর বলুন সমাজ যে জীবন দেয়নি তা কেড়ে নেওয়ার অধিকার ভোগ কি আরও শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়?

দুটো তো মাত্র বিকল্প

এক যে মানুষটাকে আপনারা শাস্তি দেন, হয় তার কোনো পরিবার পরিজন নেই, আত্মীয় স্বজন নেই, এই সমাজে, সংসারে কোনো বন্ধনই তার নেই। এক্ষেত্রে সে হয়তো স্কুলে পড়তে

BanglaBook.org

পায়নি, কোনো শিক্ষা পায়নি, তার হৃদয়, তার অনুভূতির কথা কেউ হয়তো কখনো ভেবেও দেখেনি। এইরকম এক হতভাগ্য অনাথকে কীসের অধিকারে আপনারা মেরে ফেলতে পারেন? তার শাস্তি পাওয়ার মূল কারণ কী? কারণ সে এক বঞ্চিত লাঞ্ছিত বলে; সে শিক্ষা পায়নি বলে; সহায় সম্বলহীন বলে? এই একাকীত্ব, এই নিঃসঙ্গতা যার মধ্যে আপনারাই ওকে ঠেলে দিয়েছেন, সেটাকেই এখন তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চাইছেন? তার দুর্ভাগ্যকে আপনারা অপরাধ বলে গণ্য করছেন! কোনটা ঠিক বা কোনটা ভুল কোনোকিছুই তো তাকে কেউ কোনোদিন শেখায়নি। মানুষটা তাই অজ্ঞ। ওর নিয়তিটাই হচ্ছে তাহলে আসল অপরাধী। কোনোভাবেই ও নিজে নয়। সুতরাং আপনারা এক নির্দোষ মানুষকে শাস্তি দিচ্ছেন।

দুই অথবা লোকটির হয়তো একটি পরিবার আছে; আর সেক্ষেত্রে কি আপনারা বিশ্বাস করেন যে তার গলাটা কেটে দিলে সেই শুধু একমাত্র শাস্তি পাবে? তার সঙ্গে তার মা বাবা, তার স্ত্রী পুত্র কন্যাদের কি রক্তক্ষরণ হবে না? অতি অবশ্যই ওরাও রক্তাক্ত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে মানুষটিকে মেরে ফেলে আপনারা তো গোটা একটা পরিবারের গলাটাই কেটে দিচ্ছেন। তাই আবারও, এক্ষেত্রেও আপনারা নির্দোষদেরই শাস্তি দিচ্ছেন।

ওফ্, কি অন্ধ, কি কদর্য এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যা সবদিকেই শুধু নিরপরাধীদেরই আঘাত হানে!

যদি অপরাধী মানুষটির একটি পরিবার থেকে থাকে তাহলে কেন তাকে বন্দি করে রাখা হবে না? তাহলে বন্দিবাসে থেকেও সে তো তার পরিবারের জন্য, আর ওপর যারা নির্ভরশীল তাদের জন্য কাজ করতে পারে। কিন্তু সমাধিক্ষেত্রের মাটির গভীর থেকে কেমন করে সে তার সাহায্যের হাত ওদের পানে বাড়াবে? আপনারা কি শিউরে না উঠে ওর ওইসব ফুলের মতো ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারবেন যারা তাদের পিতা হারালো? আর ওদের প্রাত্যহিক খাবার? আপনারা কি এই মানুষটির পরিবারের ছেলেদেরও জেলে পাঠাবার কথা ভেবে রেখেছেন, আর মেয়েদের পাঠাতে চাইছেন অশ্লীল জীবন যাপনের নরকে? হা ঈশ্বর! নিরপরাধ অপরাধীদের এ কেমনতরো শাস্তি!

উপনিবেশে, যখন কোনো ভৃত্যকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তখন সেই ভৃত্যের মালিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে হাজার ফ্রাঙ্ক পেয়ে থাকে, এভাবেই আপনারা মালিকের ক্ষতিপূরণ করেন বটে কিন্তু সেই হতভাগ্যের পরিবারটির কোনো ক্ষতিপূরণই করতে পারেন না। সেইভাবে এদেশে যে হতভাগ্যের শাস্তি হয় তার পরিবারকে তারই মালিক হিসাবে গণ্য করা কি যায় না? মনিবের কাছে এক ভৃত্যের অবস্থানের থেকে পরিবারের কাছে দণ্ডিত মানুষটির অবস্থান কি আরো বেশি গ্রহণযোগ্য নয়? অন্তত স্ত্রী পুত্রদের অধিকারবোধটাকে কিছুমাত্র গণ্য করলে?

আপনাদের আইন নিজেই প্রথমত খুনের অপরাধে অপরাধী তো ছিলই, এখন আবার তার সঙ্গে চুরির দায়ভারটাও বর্তাচ্ছে। আরো একটা কথা আপনারা কি হতভাগা মানুষটার মনের কথাটা একবারও ভেবে দেখেছেন? ভেবে দেখেছেন কতখানি মূল্য তাকে তার অপরাধের জন্য দিতে হয়? তাই তাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি শেষ করতে আপনাদের বুকগুলো কি একটুও কেঁপে ওঠে না? আগে অন্তত মানুষের বিশ্বাস বলে তবু একটা বস্তু ছিল। শেষ সময়ে ধর্মের বাণী দাগী আসামীকেও কিছুটা ধর্মপ্রাণ হতে সাহায্য করতো। তখন দণ্ডিতেরও অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ ছিল। সমাজ যখন তাকে ত্যাগ করতো তখন ধর্ম তাকে এক অন্য সমাজের প্রবেশাধিকার দিতো। তার হৃদয় তখন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে চাইতো। ফাঁসির মঞ্চ তখন, হৃদয়ের পরিবর্তনের জন্যই হয়তো, স্বর্গের দুয়ার হিসেবে গণ্য হতো। কিন্তু এখন

BanglaBook.org

একজন অপরাধীর ফাঁসির মঞ্চের ওপর কতখানিই বা বিশ্বাস থাকতে পারে যখন সাধারণ মানুষেরই বিশ্বাসের ভিত এর ওপরে টলে গেছে? ধর্মবিশ্বাসের সারা দেহ এখন দগদগে ঘায়ে ভর্তি হয়ে গেছে। সেই পুরনো খোল ভাঙা এক জাহাজের মতো যা এককালে আমাদের নতুন পৃথিবীর সন্ধান দিয়েছিল। অথচ এখন যেটা আমাদেরই বন্দরের একপাশে পড়ে আছে নিদারুণ অবহেলায়, অনাদরে। আর প্রতিদিনই একটু একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। এখন আমাদের শিশুরাও কি ঈশ্বরকে বুড়ো আঙুল দেখায় না? তাহলে কোন অধিকারে আপনারা দণ্ডিতদের অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে পাঠাতে পারেন, বিশেষ করে সেইসব হৃদয়গুলোকে যা ভলতেয়ার ও মঁসিয়ে পিজঁত লেব্রান-এর সৃষ্ট, এক সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে যে স্থান সম্পর্কে আপনারা নিজেরাই অন্ধকারে? এইসব দণ্ডিতদের আপনারা জেলের যাজকের হাতে সমর্পণ করেন যিনি অবশ্যই একজন ভীষণ ভালো ভদ্রলোক, এক বৃদ্ধ সমব্যথী। কিন্তু তিনি নিজেই কি বিশ্বাস করেন যে এদের মনে তিনি ধর্মভাব আনতে সক্ষম হবেন? যদি ধর্মের বাণী শোনাবার কাজটা একটা একঘেয়ে নিরানন্দময় কাজ হিসেবেই তাঁর কাছে গণ্য হয় তাহলে? এই বৃদ্ধ মানুষটিকে যিনি গাড়িতে ঘাতকের ঠিক পাশেই থাকেন তাঁকে কি তাহলে সত্যিই একজন ধর্মযাজক বলে পরিগণিত করা যায়? এক ধীমান ও সাহসী লেখক যেমন বলতে পেরেছেন যে মানুষটা দোষ স্বীকার করলো তাকে বলি দেওয়াটা আর তার ঘাতককে বহাল তবিয়তে পুষে রাখাটা কি নিষ্ঠুর এক প্রথা!

কোনো সন্দেহ নেই যে, এই কথাগুলো শুধু 'আবেগতাড়িত' বলেই গণ্য হবে সেইসব সম্ভ্রান্ত লোকেদের কাছে যাঁরা আনন্দের সঙ্গে অতি পরিচিত এবং যাঁদের যুক্তিতে আবেগের থেকে বেশি প্রাধান্য পায় বাস্তবতা। কিন্তু আমাদের মতে এগুলো যদি আবেগও হয় তাহলেও সেগুলো বৈধ ও সমর্থনীয়। প্রায়শই আমরা মস্তিষ্কপ্রসূত যুক্তির চেয়ে হৃদয়াবেগ দ্বারাই তাড়িত হই বেশি। তার সঙ্গে একথাটাও ভুললে চলবে না যে, আবেগ বা যুক্তি যাই হোক না কেন ওরা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। দ্য স্পিরিট অব ল-এর গুঁড়িতে যেমন জোড়া লাগানো হয়েছে ট্রিটি অন ক্রাইমস-কে মন্টেস্কু যেমন বাক্কারিয়ার পিতা।

তাহলে বুঝুন যে, কারণ আমাদের সপক্ষে, আবেগ আমাদের সপক্ষে এবং অভিজ্ঞতাও আমাদেরই পক্ষে। নামোল্লেখ করার মতো যেসব রাজ্যে মৃত্যুদণ্ডকে বাতিল করা হয়েছে সেইসব জায়গায় হত্যা অপরাধ এবং অন্যান্য অপরাধের সংখ্যা প্রত্যেক বছর নিয়মিতভাবে কমছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই চরম ব্যবস্থাটিকে কি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাদের বিচার করা উচিত নয়?

তথাপি আমরা বলবো না যে হঠাৎ করে আপনারা মৃত্যুদণ্ডটিকে উঠিয়ে দিন, বরং বলবো সবরকম সাবধানতা অবলম্বন করে যে বন্দিবাসের কথা বলেছি তা কিছুকালের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে দেখুন না। এখন যে আমরা শুধু মৃত্যুদণ্ডকে বাতিল করার সপক্ষে সওয়াল করছি মাত্র এটাও ঠিক কথা নয়, আমরা যা চাই তা হলো বন্দি করা থেকে শিরশ্ছেদ করা পর্যন্ত যে নীতি চালু আছে তার পুনরায় পর্যালোচনা করা এবং শেষমেষ শিরশ্ছেদ যদি করতেই হয় তাহলে তাকে যথারীতি পরিচালনা করার জন্য যতটা সময় দেওয়া প্রয়োজন তা নিশ্চিত করা। পরিচালনাগত নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে আমাদের বিস্তারিত মতামত অন্যান্য লেখার মাধ্যমে জানাতে পারবো আশা করছি।

তবে জালিয়াতি, অগ্নিসংযোগ, ডাকাতি ইত্যাদি এ জাতীয় প্রধান প্রধান অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের রায় শোনার আগে জজ সাহেবের উচিত জুড়িদের সামনে নিচের প্রশ্নটা রাখা

BanglaBook.org

'অপরাধী কি আবেগতাড়িত হয়ে নাকি নিজের স্বার্থের খাতিরে কাজটা করেছে?' আর জুড়িদের উত্তর যদি হয় 'আবেগতাড়িত হয়ে' তাহলে সেক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত নয়। এভাবেই কিছু মৃত্যুদণ্ড আমাদের এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিন। আলবাক ও ডেবাকারদের মতো লোকেদের জীবনগুলো তাহলে বেঁচে যায়। ওথেলোকেও গিলোটিনের নিচে শুতে হয় না।

আপনাদের একটা কথা পরিষ্কারভাবে বোঝা উচিত যে মৃত্যুদণ্ড জরুরি অথবা জরুরি নয় এই ধন্দ প্রতিটি চলে যাওয়া দিনের সঙ্গে বাড়ছে বই কমছে না। আজ আমাদের কাছে যেটা জলের মতো পরিষ্কার আগামিকাল গোটা সমাজের কাছে সেটা সেইরকমই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এবং সবচেয়ে নির্মম ও কঠোর অপরাধবিজ্ঞানীরাও শুনলে হয়তো ভালোই করবেন যে গত এক দশক ধরে মৃত্যুদণ্ডের হার ক্রমেই কমছে। ক্ষমা প্রদর্শন ক্রমেই বেশি মাত্রায় হচ্ছে। এটা যেমন বার্ধক্যের নিদর্শন তেমনি দুর্বলতারও বটে। হয়তো বিসর্জনের সময় হয়েছে। ইদানীং তাই অত্যাচার ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ফিরে যাচ্ছে চাকা। ক্রুশও। তাই যতই আশ্চর্য শোনাক না কেন গিলোটিনই প্রগতির দ্বার খুলে দিয়েছে।

মঁসিয়ে গিলোটিন একজন জনদরদি মানুষ ছিলেন।

হ্যাঁ, ফারিনাসিয়াস ও লে ভঁগ্লা, ডেলানক্স ও আইজাক লইজেল, দ্য পেদ এবং ম্যাকাল্ট[৭]-এর সেই রক্তপিপাসু তলোয়ারের মতো বাঁকা দাঁতের থেমিস (গ্রিকদের বিচারের দেবী) দৃশ্যতই আর পারছেন না বোঝা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে উনি অস্তাচলে যাচ্ছেন। উনি মরে যাচ্ছেন।

লা গ্রীভ-এর পেট তো এখন ভর্তি। আর জায়গা নেই। তাই এখন সে ভুল শোধরানোর চেষ্টায়। ওই রক্ত চোঁষা বুড়ি গোটা জুলাই মাসটা বেশ ভালো ছিল। এখন সে একটু উন্নতমানের জীবন যাপন করে লোকের মনে দাগ কাটতে চায়। গত তিনশো বছর ধরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত সমস্ত অপরাধীর গরম রক্তে পিপাসা মিটিয়ে বুড়ি এখন চরম লজ্জিতা। নিজের নামটাকে পর্যন্ত ও এখন ঘৃণা করে। ওই নামে ওকে ডাকা হোক এটাও যেন সে আর চায় না। ইদানীং ঘাতককে পর্যন্ত ও আর স্বীকার করে না। নিজের বুকের রক্তাক্ত পাথর-টাথরগুলো ও এখন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছে।

এই লেখাটি যখন লেখা হচ্ছে তখন কিন্তু সব মৃত্যুদণ্ডই কার্যকর করা হয় প্যারিসের বাইরে। অতএব একথা বুঝতে যেন ভুল না হয় যে প্যারিস ছেড়ে চলে যাওয়া মানেই সভ্যতাকে পেছনে ফেলে চলে যাওয়া।

আজ সমস্তরকম যুক্তিই তো আমাদের পক্ষে। এটা আরো বেশি করে মনে হচ্ছে তার কারণ কাঠ ও লোহার তৈরি ওই রাক্ষুসে মেশিনটা যার নাম গিলোটিন, পিগম্যালিয়ন[৮]-এর কাছে যা ছিল গালাতিয়া, সেটাও শেষ পর্যন্ত হুকুমমাফিক কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করছে। একদিক থেকে আগে যে ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো হয়তো বা সুখবরেরও ইঙ্গিতবাহী। গিলোটিনে মরচে পড়ছে। ওটা ওর বিশ্বাসযোগ্যতাও হারিয়েছে অনেকটাই। এতকাল যেটা মৃত্যুদণ্ডকে উপভোগ করে এসেছে সেটা নিজেই আজ অপরাধীর মতো কাঁপছে। থমকে থমকে বুড়োদের মতো হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ছে।

এটা আমাদের স্থির বিশ্বাস যে ওই কুখ্যাত মেশিনটা চিরকালের মতো ফ্রান্স ছেড়ে বিদেয় হবে। এবং ঈশ্বর চাইলে অপরিসীম বেদনায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে। কারণ প্রথমেই তো আমরা আঘাতে আঘাতে ওটাকে বিধ্বস্ত করে তুলতে চাইবো।

BanglaBook.org

এরপর যেখানে ওর মন চায় চলে যাক, চাইলে কোনো অসভ্য বর্বর জাতির আতিথেয়তা গ্রহণ করুক। কিন্তু ওটা যেন সেই আতিথেয়তা কখনোই না প্রগতিশীল তুরস্ক বা অন্য কোনো জংলী উপজাতির (হুগোর নোট তাহিতির সংসদ কিছুদিন আগেই মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থাকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে) কাছ থেকে পায়। কারণ এ ব্যাপারে ওদের কোনো সংস্রবই নেই। তার চেয়ে ওটা বরং সভ্যতার মই বেয়ে আরো অনেক নিচে নেমে যাক। সেটা স্পেন বা রাশিয়া যেখানেই হোক না কেন।

অতীতের সামাজিক কাঠামো তিনটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকতো যাজক, রাজা আর ঘাতক। বহুদিন আগেই একটা কণ্ঠস্বরকে বলতে শোনা গিয়েছিল 'ঈশ্বরেরা ফিরে যাচ্ছেন।' মাত্র কিছুদিন আগে অন্য আরেকটা কণ্ঠস্বরকে চিৎকার করতে শোনা গিয়েছিল 'রাজারা ফিরে যাচ্ছেন!' এবার তৃতীয় এক কণ্ঠস্বর শোনার হয়তো সময় এসেছে যে বলবে চিৎকার করে 'ঘাতক ফিরে যাচ্ছে!'

এভাবেই একটার পর একটা ভিত্তি প্রস্তরের বিচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে পুরনো সমাজ ব্যবস্থাটাও ভেঙে পড়বে। এভাবেই ঈশ্বর অতীতের ধ্বংস সম্পূর্ণ করবেন।

'ঈশ্বর চলে যাচ্ছেন' বলে যারা বিলাপ করেছিল তাদের বলা যেতে পারে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন। কিন্তু ঘাতক চলে যাচ্ছে বলে যারা কাঁদবে তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কিছুই থাকবে না।

তবে খবরদার যেন বিশ্বাস করে বসবেন না যে ঘাতক চলে যাওয়ার সাথে সাথে দেশে আইন শৃঙ্খলাও নির্বাসিত হবে। এই লোকটি বিদায় নিলে ভবিষ্যৎ সমাজের ছাদ মোটেই ভেঙে পড়বে না। সভ্যতা তো ক্রমবিকাশশীলতার ও পরিবর্তনশীলতার এক স্রোতস্বিনী। তাহলে কপাল ঠুকে আমরাও কি শাস্তির আইনে কিছু পরিবর্তনের আশা করতে পারি না? মহান যীশুর ক্ষমাশীলতা যেদিন গোটা আইনের বইটাকে ছুঁয়ে যাবে সেইদিন নিজস্ব আলোতেই বইটা ভাস্বর হয়ে উঠবে। সেইদিন সমস্তরকম অপরাধই এক এক প্রকার অসুস্থতা বলে গণ্য হবে। সেই অসুখ সারানোর ডাক্তারেরা আপনাদের জজেদের জায়গা নেবে। আর সেই উদ্দেশ্যে আপনাদের ব্যবহৃত বন্দিশালাগুলো হাসপাতাল নামে চিহ্নিত হবে। স্বাধীনতাকে গণ্য করা হবে স্বাস্থ্যের সমতুল বলে। তেল ও মলম লাগানো হবে অপরাধীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সেইসব স্থানে যেখানে একদিন লোহার শেকল পড়ানো থাকতো অথবা গরম লোহার ছোঁয়ায় পুড়িয়ে তাদের চিহ্নিত করে রাখা হতো। যে দুর্বল, অসহায় দেহগুলো একদা শক্তিমান, কুটিল চাবুকের আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত হয়ে যেতো তাদের জন্য তখন থেকে তোলা রইবে শুধুই ভালোবাসা আর সহমর্মিতা।

ফাঁসির মঞ্চের পরিবর্তে ক্রুশ
ঐশ্বরিক অথচ কত সাদাসিদে।

ভিক্টর হুগো
১৫ মার্চ ১৮৩২

BanglaBook.org

এক দণ্ডিতের শেষ দিন

১.

বিসেথ্রে

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত!

গত পাঁচ সপ্তাহ ধরে আমি এই ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের ঘোরে বেঁচে আছি। এই দুর্ভাবনার কালো ছায়া আমাকে বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে। এর পাহাড় প্রমাণ ভারের নিচে আমি চিরকালের মতো কুঁজো হয়ে গেছি!

একদিন ছিল যখন আমি আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই ছিলাম যদিও সেই একদিনকে আজ মনে হয় যেন মাত্র কয়েক সপ্তাহ নয়, যেন কত কত যুগ আগে। আমার হাজার কাজ, হাজার চিন্তা তখন মিনিট, ঘণ্টা, দিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতো। আমার চিন্তাশক্তি তখন ছিল তাজা ও প্রখর—কত সব রঙিন স্বপ্নে রং করা। ভীষণ ভালো লাগতো ওইসব রঙিন স্বপ্নের মিছিলে ছুটে ছুটে হারিয়ে যেতে আর জীবনের রুক্ষ, ছোটখাটো ব্যাপারগুলোকেও রামধনু রঙে রং করতে। আমার সেইসব দিনগুলোকে ঘিরে ছিল যুবতী নারীদের হুল্লোড়, পাদ্রী সাহেবের আলখাল্লা, যুদ্ধে জেতার আনন্দ, আলোয় আলো থিয়েটার হলের হাতছানি এবং আরো কত যুবতীর দল যাদের নরম হাতে হাত রেখে আমি কতবার হেঁটে গেছি রাত্রির বুক ফালা ফালা করে বাদাম গাছের ছড়িয়ে দেওয়া শাখা-প্রশাখার নিচ দিয়ে। আমার কল্পনার বল্গাহীন অশ্ব তখন দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটে যেতো বাধা না মানা ঝড়ের উল্লাসে। কারণ, তখন আমি ছিলাম মুক্ত ও স্বাধীন।

কিন্তু আজ আমি এক কয়েদী। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে একটা ছোট্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে আমার দেহ আজ শৃঙ্খলিত। আমার চিন্তাশক্তিও বন্দি হয়ে আছে শুধু একটি ভাবনায় যা ভয়াবহ, রক্তাক্ত ও নৃশংস। আজ আমার একটা চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা নেই—যা হলো একটি একক বন্দিদশা এবং এক নিষ্ঠুর সত্য যে আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে!

যতই চেষ্টা করি না কেন এই নারকীয় ভাবনা যেন কোনো কিছুতেই আমাকে রেহাই দিতে রাজী নয়। সীসের মতো ভারী, ভয়ংকর এক কবন্ধ যেন আমার কনুইয়ের কাছে বসে অন্য কোনো চিন্তাকে ধারে কাছে আসতেই দিচ্ছে না। ফিরিয়ে দিচ্ছে বারংবার আমার দুর্দশার প্রতিবিম্ব আমাকেই। চোখ খোলা বা বন্ধ সব অবস্থাতেই সে যেন তার বরফ-শীতল মুঠোয় আমাকে ধরে ক্রমাগত ঝাঁকিয়েই

BanglaBook.org

চলেছে। অন্য যে কোনো ভাবনার কাছেই আমি সান্ত্বনা খুঁজতে যাই না কেন সে তক্ষুণি সেই ভাবনার ছদ্মবেশে আবার আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। যত কথা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় তার সবটুকুর মধ্যে সে মিশে থাকে নিরানন্দ গণসঙ্গীতের মতো। যখন আমি আমার ঘৃণিত কারাগারের ঠান্ডা লোহার গরাদে ঠেস দিয়ে দাঁড়াই তখন সেও চুপ করে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলে সে আমাকে বিদ্রূপ করে। অবশ্য আমার চমকে চমকে ওঠা ঘুমের মধ্যেও সে আমাকে দৃষ্টির আড়াল হতে দেয় না এবং আমার স্বপ্নের মধ্যেও সে একটা বাঁকানো ছুরি হয়ে আমার কণ্ঠনালীর সামনে ক্রমাগত দোল খেয়েই চলে।

এই ভয়ংকর ভয়ের দ্বারা তাড়িত হয়েই আমি এইমাত্র ধড়মড় করে উঠে বসেছি। কিন্তু নিজেকে সান্ত্বনাও দিয়েছি এই বলে যে ওটা তো শুধুই একটা স্বপ্নমাত্র! আহ্, যদি সত্যিই তাই হতো! সীসের মতো ভারী দু-চোখের পাতা সম্পূর্ণ খুলবার আগেই এক মৃত্যুর মতো অবসাদ আমাকে ঘিরে ধরে। যে অবসাদের ইতিবৃত্ত লেখা রয়েছে বড় বড় হরফে আমার চারপাশের বিবর্ণ বাস্তবতায় আমার সেলের স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে, রাতের আলোর স্বল্পতায়, আমার পোশাকের কর্কশতায়, পাহারাদারদের সন্ত্রস্ত করা মুখে, আর তাদের অস্ত্রে, যাদের ছটা গরাদের ফাঁক দিয়েও আমাকে পাহারা দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সবাই যেন সমস্বরে আমার কানের কাছে একটানা বলে চলছিল—'তুমি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।'

২.

সেটা ছিল আগস্ট মাসের এক সুন্দর সকাল। ঠিক তিনদিন আগে থেকে আমার বিচার শুরু হয়েছে। আর এই তিনদিন আমার নাম ও আমার অপরাধ এক দঙ্গল দর্শককে যেন চুম্বকের মতো টেনে রেখেছে। প্রতিটা দিন ওরা কোর্টের বেঞ্চির দখল নিতে প্রায় হাতাহাতি করেছে। যেমন করে একটা শবদেহ দেখে কাকেদের দল চিৎকার চেঁচামেচি করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গত তিনদিন ধরে জজদের, সাক্ষীদের, বাদী-বিবাদী পক্ষের উকিলদের মিছিল আমার চোখের সামনে দিয়ে চলছিল তো চলছিলই। ভয় দেখানো অন্ধকারের মোড়কে কখনো যা লাগছিল ভীষণ হাস্যকর আবার কখনো ভীষণ ঘৃণিত। প্রথম দু'রাত তো চোখের পাতা এক করতে পারিনি। কিন্তু তৃতীয় রাতে বিরক্তি ও অবসন্নতার কাছে আমাকে নতি স্বীকার করতেই হলো। মাঝরাতেও জুরিরা যখন বাক্যব্যয় করে চলেছে সেই সময় আমাকে আমার কালকুঠরিতে খড়ের বিছানায় ফেরত নিয়ে যাওয়া হলো। আর আমি নিমেষের মধ্যে যেন ঘুমিয়ে পড়লাম—সে এক সব ভোলান ঘুম—যেন অ-নে-ক দি-নে-র প-রে কয়েক ঘণ্টার বিশ্রাম।

সেই ঘুমের গহণ থেকে ওরা আবার আমাকে টেনে তুললো। সহজে অবশ্য কারারক্ষীর ভারী বুটের আওয়াজ, তার চাবির গোছার ঝনঝনানি অথবা ভারী

BanglaBook.org

লোহার ছিটকিনি টেনে খোলার তীক্ষ্ণ আওয়াজ আমার ঘুম ভাঙাতে পারেনি। ওর রুক্ষ কর্কশ হাত ও ততোধিক কর্কশ চিৎকার—"উঠে পড়," আমার কানের কাছে হতেই আমি চোখ খুলেছিলাম। তারপর ভয়ে কাঁটা হয়ে আমি উঠে বসলাম। সেই সময় আমার ঘরটার প্রায় সিলিং-এর কাছাকাছি ছোট্ট জানলাটা থেকে ছুটে আসা একটা হলুদ আলো দেখলাম ছড়িয়ে আছে বারান্দার সিলিং-এ। ওই বারান্দাটা আমার কাছে তখন আকাশ দেখার সবচেয়ে নিকটতম স্থান ছিল। আমার কারাগৃহের অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখ বুঝতে পারলো নিশ্চিতভাবে যে ওটা সূর্যেরই আলো। আমি যে সূর্য ভালোবাসি।

'কি সুন্দর একটা ঝলমলে দিন'—আমি জেলারকে বললাম। আমার উক্তিটার উত্তর দেওয়া উচিত কি না বুঝতে না পেরে সে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর গলাটা অহেতুক কর্কশ করে বিড়বিড়িয়ে উঠলো—'মনে হচ্ছে'। আমি কোনো নড়াচড়া করলাম না। মনটার তখনো সম্পূর্ণ ঘুম ভাঙেনি। এক চিলতে হাসিতে ঠোঁট ভরিয়ে আমি তাকালাম সেই নরম, সোনালি আলোর পানে যা সিলিংটাকে চিত্রিত করে তুলেছিল।

'কি সুন্দর একটি দিন'—আমি আবার বলে উঠলাম।

'হ্যাঁ' মানুষটা জবাব দিল—'কিন্তু ওরা সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

ওর এই কথাগুলো নির্দয়ভাবে আমাকে আছড়ে ফেললো বাস্তব পৃথিবীর মাটিতে ঠিক তেমনি করে যেমন করে খুশির হাওয়ায় উড়ে চলা এক প্রজাপতি হঠাৎই মাকড়সার জালে আটকে পড়ে। অকস্মাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই অপরিচ্ছন্ন বিচারশালা, বিচারকদের বসার জন্য নোংরা কাপড়ে মোড়া কাস্তে আকারের বেঞ্চি, নির্বোধ সাক্ষীদের জন্য তিনটি সারি, আমার বেঞ্চির দুপাশে বসা দুই রক্ষী, কালো কালো গাউনগুলোর আন্দোলন, পেছনের স্বল্প আলোয় দর্শকদের মাথাগুলোর নড়াচড়া, এবং আমার শেষ বিচারের জন্য সেই বারোজন জুরীর নিষ্পলক রাত জাগা আমাকে একটু ঘুমাতে দিয়ে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার দাঁতে দাঁত লেগে খটখট করে আওয়াজ হচ্ছিল। আমার কাঁপা কাঁপা হাতদুটো ব্যর্থভাবেই খুঁজে ফিরছিল আমার পোশাক, আমার পা দুটোয় যেন কোনো জোরই অবশিষ্ট ছিল না। আমি এক পা হেঁটেই হোঁচট খেলাম একজন দুর্বল কুলির মতো যে তার পিঠের বোঝার ভারে ন্যুব্জপৃষ্ঠ। তবু জেলারকে অনুসরণ করে আমাকে এগোতেই হলো।

সেলের বাইরে দু'জন কারারক্ষী আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ওরা আমার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। সেই হাতকড়ায় একটা জটিল তালা লাগানোর ব্যাপার ছিল যা ওরা খুব মনোযোগ সহকারে শেষ করলো। আমি কোনো প্রতিবাদ করলাম না এক বিরাট যান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে চাকার একটা ইস্পাতের দাঁতের কতখানিই বা গুরুত্ব!

BanglaBook.org

ভেতরের একটা উঠান আমরা পার হয়ে গেলাম। সকালের হাড় কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়া যেন আমাকে আবার বেঁচে উঠতে বললো। মাথা তুলে দেখলাম নীল আকাশ আর লম্বা লম্বা চিমনীদের দ্বারা দ্বিখণ্ডিত সূর্য কিরণ যারা খাঁজ কাটা কাটা আলোর ছবি এঁকে দিয়েছিল জেলের নিরানন্দ দেওয়ালে দেওয়ালে। দিনটা সত্যিই সুন্দর ছিল।

আমরা একটা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। একটা বারান্দা পার হলাম। তারপর আরেকটা এবং আরো একটা। একটা নিচু দরজা খুলে গেল ও তার ভেতর থেকে এক ঝলক শোরগোল মাখা গরম হাওয়া আমার মুখে ঝাপটা মেরে গেল ওই হাওয়াটা ছিল দর্শকদের নিঃশ্বাস। যে বিচারকক্ষে আমাকে এরপর ঢুকতে হলো সেখানে ওরা জমা হয়েছিল।

আমাকে দেখতে পেয়েই ঘরের মধ্যে এক বিশাল আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। সেই আলোড়নে শামিল হলো ঘরে জমায়েত জনতার হাতের সঞ্চালন, ওদের গলার আওয়াজ, চেয়ার টানা ও পর্দা সরাবার শব্দ। দুদিকের দর্শকদের ঠেকিয়ে রেখেছিল রক্ষীবাহিনী। ওদের মাঝখান দিয়ে আমি যখন গোটা ঘরটা হেঁটে গেলাম তখন বুঝলাম যে আমিই হচ্ছি মুখ্য আকর্ষণ। আমারই প্রতি পদবিক্ষেপ পরিচালনা করছে ওইসব শূন্য মুখ আর বাঁকানো গলাগুলোকে।

ঠিক তখনই আমি লক্ষ করলাম যে আমার পায়ে আর বেড়ি নেই। কিন্তু আমার মনেও নেই যে কে বা কারা কোথায় কখন সেগুলোকে খুলে দিয়েছে। চারপাশে তখন গভীর নিস্তব্ধতা। আমি আমার জায়গায় এসে পৌঁছেছি। দর্শক ও অন্যান্যদের গুঞ্জন যখন কমে এলো তখন আমার মাথার মধ্যেকার ভোঁ ভোঁ করা ভাবটাও যেন কমে গেল, তবে এতদিন যেটা শুধু একটা ধারণা মাত্র ছিল সেটাই এখন পরিষ্কারভাবে আমাকে আঁকড়ে ধরলো সত্যি কথা শোনার সময় এসে গেছে। আর আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি।

অথচ অবাক কাণ্ড, এই ভাবনাটা যখন মনে এলো তখন কিন্তু আমার একটুও ভয় লাগেনি। জানলাগুলো খোলা ছিল, যার ভেতর দিয়ে শোরগোলের আওয়াজ আর হু-হু বাতাস শহরের রাস্তাগুলো থেকে ছুটে আসছিল। আলোয় আলোয় বিচারগৃহটাকে একটা বিয়ে বাড়ি মনে হচ্ছিল। সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ জানলা দিয়ে ছুটে এসে মেঝের বুকে নানান আকৃতির ছবি এঁকে দিচ্ছিল। টেবিলগুলোর ওপর দিয়ে ওই আলো আরো দূরে ছড়িয়ে গিয়ে যেখানে দুটো দেওয়াল মিলিত সেখানে বেঁকে গিয়েছিল। ঝিলমিল করে ওঠা সমস্ত জানলার কাঁচগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল একেকটা ঝাপসা সোনালি প্রিজম যেগুলো ভেসে বেড়াচ্ছিল বাতাসের কোলে।

ঘরটার শেষ প্রান্তে বসা বিচারকদের বেশ তৃপ্ত মনে হচ্ছিল। সন্দেহ নেই ওরা এই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছিল যে খুব তাড়াতাড়িই গোটা মামলাটার এবার ফয়সালা হয়ে যাবে। জানলার কাঁচ ভেদ করে আসা নরম আলোয় আলোকিত প্রেসিডেন্টের

BanglaBook.org

মুখটা বেশ শান্ত ও দয়ালু দয়ালু ঠেকছিল। আর একজন তরুণ ব্যারিস্টার একটি সুন্দরী রমণীর সঙ্গে খোশ-মেজাজে চুটিয়ে গল্প করেই যাচ্ছিল যে ঠিক তার পেছনের ভালো সিটটা দখল করে বসেছিল।

শুধু জুরিদেরই ভীষণ বিবর্ণ ও শুকনো মনে হচ্ছিল। সারারাত জেগে থাকার কারণে দৃশ্যতই ওদের অবসাদগ্রস্ত ঠেকছিল। কিন্তু ওদের মুখ দেখে এতটুকুও মনে হচ্ছিল না যে ওরা এইমাত্র একজন অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার সপক্ষে রায় দিয়েছে। এবং সত্যি বলতে কি মরিয়া এক ঘুমের প্রত্যাশা ছাড়া আমিও ওদের মুখগুলো দেখে আর কিছু বুঝতে পারিনি।

আমার ঠিক উল্টো দিকের একটা জানালা খুলে দেওয়া হয়েছিল বলে নদীর ধারে ফুলওয়ালী মেয়েগুলোর হাসির আওয়াজ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। আর দেখতে পাচ্ছিলাম জানলার পাথুরে গোবরাটের ফাটলে একটা সুন্দর ছোট্ট হলুদ রঙের ফুল সূর্যকিরণে স্নান করতে করতে দুলে দুলে কেমন বাতাসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় মেতেছিল।

এইসব সুন্দর অনুভূতির মাঝে কীভাবে তাহলে বিষণ্ন ভাবনারা মাথা তুললো? রোদ্দুর ও বাতাসের নদীতে ভেজা ছাড়া, মুক্তির ভাবনা ছাড়া অন্য কোনো কথাই আমি ভাবতে পারছিলাম না। সূর্যের প্রখরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের মধ্যে আশার পারদটাও বাড়তে লাগলো এবং আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তভাবে দণ্ডাদেশ শোনার অপেক্ষায় ছিলাম এমন একজন মানুষের মতো যে শুধু আশা করে মুক্তির ও জীবনের।

ইতিমধ্যে আমার উকিলও এসে গেছেন। বেশ মৌজ করে ব্রেকফাস্টটা সেরেছেন বলে একটু যা দেরি। নিজের চেয়ারে গুছিয়ে বসতে বসতে তিনি আমার দিকে একটু ঝুঁকে হাসিমুখে বললেন—'এখনো আশা আছে।'

'আমি নিশ্চিত যে আশা আছে'—হাসিমুখে আমিও উত্তর দিলাম।

'অবশ্যই আছে'—উনি বলতে থাকলেন—'অবশ্য আমরা এখনো জানি না যে গোটা ব্যাপারটা ওঁরা কোন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করেছেন। কিন্তু যেহেতু ওঁরা বিশ্বাস করতে পারছেন না যে এটা আপনার পূর্বপরিকল্পিত অপরাধ সেইজন্য বোধহয় আপনার আজীবন সশ্রম কারাদণ্ডই হবে।'

'আপনি কি বলছেন স্যার'—ক্ষোভের সঙ্গে আমি বললাম—'এর চেয়ে মৃত্যুদণ্ডও তো হাজার গুণে ভালো।'

আমার বুকের ভিতর থেকে যেন একটা কণ্ঠস্বর আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিল—'হ্যাঁ, মৃত্যুই ভালো। তবে শীতের ঠান্ডা বর্ষা ভেজা মাঝরাত ছাড়া কোন সময় আর তেল পুড়িয়ে অপরিচ্ছন্ন বিচারশালায় কারো মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে? কিন্তু আগস্ট মাসের সুন্দর এক দিনে সকাল আটটায় এমন সব সহমর্মী জুরীদের কাছ থেকে এইরকম এক শাস্তির কথা শোনার চিন্তাও তো অকল্পনীয়! তাই আমার দৃষ্টি আবার ছুঁয়ে গেল রৌদ্রস্নাত সেই সুন্দর ছোট্ট হলুদ ফুলটাকে।

BanglaBook.org

ঠিক তক্ষুণি কোর্টের প্রেসিডেন্ট, যিনি আমার উকিলের আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন, আমাকে বললেন উঠে দাঁড়াতে। কারারক্ষী আমার হাত ধরতেই সমস্ত দর্শকেরা উঠে দাঁড়ালো।

একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি, যে জজ সাহেবের ডায়াসের নিচে একটা টেবিল সামনে নিয়ে বসে ছিল, সে নিশ্চয়ই কোর্টের এক কেরানীই হবে। সে উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে আমার অনুপস্থিতিতে জুরীরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল তা স্পষ্ট গলায় পড়ে শোনালো। সেটা শুনে আমি পাশের দেওয়ালে দেহের ভার রাখলাম যাতে না পড়ে যাই।

'বাদী পক্ষের উকিল, অভিযুক্তের শাস্তি প্রশমনের ব্যাপারে আপনার কি কিছু বলার আছে?'—জজ সাহেব প্রশ্ন করলেন।

উকিল কি বলবে। আমারই তো কত কিছু বলার ছিল। কিন্তু কোনো কথাই আমার মনে এলো না। আমার জিভটা যেন টাগরার সঙ্গে জোড়া লেগে রইলো।

আমার উকিল উঠে দাঁড়ালেন।

দেখলাম যে তিনি জুরীদের সিদ্ধান্তকে লঘু করার চেষ্টা করছেন এবং তাদের দেওয়া দণ্ডাদেশের পরিবর্তে একটু কম শাস্তির জন্য দরবার করছেন। তাঁর মতে যে শাস্তি পাওয়া (অর্থাৎ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড) আমার প্রায় নিশ্চিত ছিল এবং যে শাস্তির কথা শুনে আমি খুব রেগেও গিয়েছিলাম তাঁর ওপর।

আমার এইসব পরস্পর বিরোধী হাজারটা অনুভূতির মধ্যে বোধহয় ঘৃণামিশ্রিত দ্বেষই সবচেয়ে শক্তিশালী রূপে প্রকট হয়েছিল। সেজন্য আমার উকিলকে আমি যা আগে বলেছিলাম সেটাই আমি চিৎকার করে আবার বলতে চেয়েছিলাম—'ওই শাস্তির চেয়ে মৃত্যুও বোধকরি হাজার গুণে ভালো।' কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হলো না। আমার উকিলকে সজোরে চেপে ধরা ছাড়া আর কিছুই আমি করতে পারলাম না। পাগলের মতো কাঁদতে কাঁদতে শুধু বলতে পারলাম—'না'!

রাজার উকিল আমার উকিলের যুক্তি সুচারুভাবে খণ্ডন করলেন। এক সম্মোহিত বোবা মানুষের মতো আমি যা শুনলাম। তারপর জজ সাহেবেরা তাঁদের কাগজপত্তর গুছিয়ে চলে গেলে প্রেসিডেন্ট আমার দণ্ডাদেশ আবার পড়ে শোনালেন।

দর্শকেরা তুমুলভাবে চিৎকার করে উঠলো—'মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত!' তারপর আমাকে যখন টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন গোটা ঘরটাই সেইরকম বিকট আওয়াজ করতে করতে আমার পিছনে পিছনে ছুটে এসেছিল যেমনটা হয় গোটা একটা বাড়ি ধ্বসে পড়ে যাওয়ার সময়, আর আমি হাঁটছিলাম তো হাঁটছিলাম। যেন হুঁশ-জ্ঞানহীন নেশাগ্রস্ত এক মাতাল।

হঠাৎই যেন আমার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন এসে গেল। মৃত্যুদণ্ডাদেশ শোনার আগে অবধি আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আমার হৃৎপিণ্ড শ্বাস টানছে ও ছাড়ছে,

BanglaBook.org

লাব-ডুব শব্দও হচ্ছে। আর আমার এই দেহটা তখনো জনসমাজেই বাস করছে। কিন্তু এখন আমি ভীষণভাবে অনুভব করতে পারলাম যে সাধারণ মানুষ ও আমার মধ্যে একটা পাহাড় প্রমাণ পাঁচিল উঠে গেছে। কোনোকিছুই আর আগের মতো নেই। জানালায় সূর্যের আলো, পরিষ্কার নীল আকাশ, ওই সুন্দর হলুদ ফুলটি—সবই যেন কাফনের রঙের মতো, মৃত্যুর মতো বিবর্ণ হয়ে গেছে। আর ওইসব নারী, পুরুষ, বাচ্চাগুলো যারা আমার পেছনে ভিড় করেছিল তাদের সকলকে আমার প্রেতাত্মা বলেই মনে হলো।

সিঁড়ির নিচে কালো তারের জাল দিয়ে ঘেরা একটা গাড়ি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। গাড়িটার মধ্যে ঢোকার আগে আমি গোটা চত্বরটার চারপাশে একবার অলসভাবে তাকালাম। 'ওর মৃত্যুদণ্ড হয়েছে' বলতে বলতে দর্শকের দল আমার গাড়িটার কাছে ছুটে আসতে চাইলো। বাইরের পৃথিবী ও আমার মধ্যে যে কুয়াশার আস্তর তৈরি হয়েছিল সেই কুয়াশা ভেদ করে আমি দেখলাম যে দু'জন সুন্দরী যুবতী একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দু'জনের মধ্যে ছোটটি হঠাৎই হাততালি দিয়ে বলে উঠলো—"আজ থেকে আর ঠিক ছ'সপ্তাহ পর।"

৩.

মৃত্যুদণ্ড!

হ্যাঁ, কেনই বা নয়? কোন একটা বইয়ে যেন পড়েছিলাম মনে হলো যে মানুষই বলো বা অন্য কোনো জীবই বলো, প্রত্যেকেই তো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। শুধু কারো ক্ষেত্রে এই দণ্ড ক'টা দিন আগে অথবা ক'টা দিন পরে। তাহলে কি আমার জৈবিক অবস্থানগত কোনো পরিবর্তন ঘটেছে?

ভেবে দেখুন তো, যে মুহূর্ত থেকে আমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে সেই সময় থেকে এই অবধি কতো কতো লোক মরে গেছে যদিও তারা সবাই আরো অনেক অনেক দিন বাঁচার জন্য ভীষণ রকমই প্রস্তুত ছিল। কতো যুবক, যুবতী, স্বাধীন, স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ জীবনকে অকালেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে যারা প্লেস দ্য গ্রীভ-এ একদিন আমার শিরশ্ছেদ দেখবে বলে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছিল। এবং সেই ভোর আসার আগে অবধি কে জানে আরো কতো লোক যে মারা যাবে যারা আজ ভীষণভাবে বেঁচে রয়েছে, শ্বাস টানছে, নিজেদের ইচ্ছেমতো সব কাজ করছে স্বাধীনভাবে।

যাইহোক, শুনবেন জীবনে আমি কী হারাতে চলেছি? বন্দি জীবনের বিষণ্নতা, কালো পাউরুটি, বালতিতে কয়েদীদের জন্য বরাদ্দ সবজির সুরুয়া, দুর্ব্যবহার (যা একজন শিক্ষিত মানুষের কাছে ভীষণ রকম কষ্টদায়ক), জেলার ও কারারক্ষীদের অপ্রয়োজনীয় নির্মমতা, দু-একটি প্রাণবন্ত মানুষের উপস্থিতি যাঁরা আমার সঙ্গে কথা

BanglaBook.org

বলতে আসবেন অথবা আমি হয়তো তাঁদের কথার উত্তর দেবো, আমার কৃতকর্মের জন্য আমি যে শাস্তি পাবো তার ভয়ে নিরন্তর কেঁপে চলা—এইসব সুযোগ সুবিধাগুলোই (!) বুঝিবা ঘাতক আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে। এইটুকুর জন্য এমন ভয়াবহ এক আয়োজন?

৪.

কালো গাড়িটা আমাকে এই ঘৃণ্য জায়গাটায় বয়ে নিয়ে এলো—বিসেত্রে।

একটু দূর থেকে দেখলে বাড়িটাকে বেশ জমকালো বলেই তো মনে হয়। পাহাড়ের ওপর বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে বিস্তৃত বাড়িটা এখনো খানিকটা তার প্রাসাদোপম সৌন্দর্য্য ধরে রেখেছে—এমনটাই মনে হয়। কিন্তু যতোই কাছে এগোনো যায় ততোই সেটাকে একটা গোয়ালের মতো ঠেকতে শুরু করে। ভাঙা চোরা ঘর বা কুঠরিগুলো চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাড়িটার মধ্যে যেন একটা নির্লজ্জ দারিদ্র্য হাঁ করে আছে যেটা তার প্রাসাদোপম বহিরঙ্গের সঙ্গে মোটেই মানানসই নয় মনে হয় দেওয়ালগুলো যেন ভীষণ অসুস্থ। ঘরগুলোর মধ্যে একটা জানালার কাঁচও আস্ত নেই, আছে শুধু মোটা মোটা লোহার গরাদগুলো আড়াআড়ি, যাদের ওপর পাণ্ডুর মুখ চেপে দাঁড়িয়ে হয় কোনো কয়েদী নয়তো কোনো পাগল।

কাছ থেকে দেখলে মুক্ত জীবনের তুলনায় ভীষণ বিসদৃশ লাগে।

৫.

আমি পৌঁছানো মাত্র শক্তসমর্থ কারারক্ষীরা আমার দায়িত্ব নিয়ে নিল। সমস্ত রকম সাবধানতা যে অবলম্বন করা হলো একথা বলাই বাহুল্য আমার খাবার জন্য কোনো ছুরি বা কাঁটা চামচ নয়, কয়েদীদের জন্য নির্দিষ্ট লম্বা ঢোলা আলখাল্লা, একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, পিছমোড়া করে হাত বাঁধা, কোনোটাই বাকি রইলো না। ওদের কাজ হলো শুধু আমাকে বাঁচিয়ে রাখা। শাস্তির বিরুদ্ধে আমার আবেদনের শুনানি তখনো চলছিল যে। সে এক বিশাল জটিল ব্যাপার যেটা ছ'সাত সপ্তাহ পর্যন্ত গড়াতে পারে। সেটা শেষ হলে প্রায় নিশ্চিতভাবেই আমাকে প্লেস দ্য গ্রীভ-এ সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় চালান করতে হবে।

প্রথম ক'টা দিন আমার সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহার করা হলো যা আমার অবস্থার সঙ্গে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তারপর হঠাৎই একদিন কারারক্ষীদের শ্রদ্ধা ট্রদ্ধা সব ভোঁ ভাঁ। যাইহোক পুরনো অভ্যাস ফিরে পেতে কয়েকটা দিনের বেশি আমার সময় লাগলো না যখন ওরা আমার সঙ্গে, অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে যেমন করে, তেমনি নির্দয় ব্যবহার শুরু করলো। অবশ্য সেটা করে ভালোই হয়েছিল কারণ ওদের

BanglaBook.org

আগের সেই স্বল্প মার্জিত ব্যবহার আমাকে সব সময়েই ঘাতকের কথাটা মনে করিয়ে দিত। যাই হোক আমার দন্ডাদেশটাই একমাত্র ব্যাপার ছিল না। আমার যৌবন, আমার মার্জিত ব্যবহার, চার্চের যাজকের মধ্যস্থতা এবং ক'টা শক্ত শক্ত ল্যাটিন শব্দ যেগুলো আমি প্রধান জেলারের সঙ্গে কথা বলার সময় ব্যবহার করেছিলাম (বলাই বাহুল্য যে সেগুলো তার মাথার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিল) যার ফলে আমাকে অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে সপ্তাহে একদিন বেড়াবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের জন্য নির্দিষ্ট, দমবন্ধ করা পোশাকটাকেও খোলবার অনুমতি পেয়েছিলাম। প্রাথমিক কিছু অনিচ্ছা দেখানোর পর ওরা আমাকে লিখবার জন্য কালি, কলম, কাগজ এবং রাত্রে ব্যবহারের জন্য একটা আলোর বন্দোবস্তও করে দিয়েছিল।

প্রতি রোববারে উপাসনার পর ব্যায়ামের সময় আমাকে ঘেরা জেলচত্বরে ঘুরে বেড়াবার অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। সেখানে অন্যান্য বন্দিদের সঙ্গে আমার গল্প-গুজব হতো। কারণ সেখানে গল্প না করে থাকাটা বলতে গেলে প্রায় অসম্ভবই ছিল। সেই হতভাগ্য কয়েদীগুলোকে আমার অবশ্য মন্দ লাগতো না। ওরা ওদের এমন এমন সব অপকর্মের কথা বলে যেত যেগুলোকে সব বিশ্বাস করলে ভয়ে মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠতে বাধ্য। ওরা আমায় অশ্লীল ভাষায় কথা বলতে শিখিয়েছিল, যেটাকে ওরা বলতো 'বাওয়ালী'। এটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন, ঘৃণ্য লোমফোঁড়ার মতো একটা ভাষা, যা ওরা বানিয়েছিল প্রতিদিনের কথাবার্তা থেকে। এক একটা ক্ষেত্রে ওই কথাগুলোর মধ্যে সাংঘাতিক একটা নির্মমতা ফুটে বেরোত যা সত্যিই মনকে নাড়া দেওয়ার মতো এবং ভয়ংকরভাবে বর্ণনাময়। যেমন 'রাস্তায় রক্ত' 'বিধবার সঙ্গে লটকে দেওয়া' যার অর্থ ছিল ফাঁসির মঞ্চে কেটে ফেলা। বলা হতো এমনভাবে যেন গিলোটিনের দড়িগুলোই পূর্ববর্তী দণ্ডিত ব্যক্তিদের কবল থেকে কোনোমতে বেঁচে গেছে। একজন চোরের মাথার দু'রকম মানে ছিল 'স্বপ্নের চূড়া,' অর্থাৎ কিনা ভেবে চিন্তে অপরাধ করা; বা 'তোমার বাদাম' অর্থাৎ ঘাতক যখন সেটাকে কেটে ফেলে। কখনো বা সঙ্গীতশালার রসিকতা, যেমন 'কঞ্চির শাল' অর্থাৎ কাপড় কুড়ানোওয়ালীর ঝোলা বা বস্তা, অথবা 'ছোট চুক্‌লিখোর' অর্থাৎ জিভ। আর ক্রমাগত যেটা ঘটেই চলেছে সেটাকে ওরা বলতো 'ঐন্দ্রজালিক,' 'রহস্যময়,' 'বদখত' বা 'নোংরা'। এইসব শব্দের কোনো কৌলিন্য ছিল না। 'ব্লেডের দৌড়বীর'—মানে মোড়ল বা মুখিয়া, 'বালতি' মানে মৃত্যু, 'বোর্ড বিক্রি' মানে বধ্যভূমি। ব্যাঙ ও মাকড়সার মতো ওরা আওয়াজ করতো। এই ভাষায় ওদের কথা বলতে শুনলে মনে হবে যেন এক বান্ডিল নোংরা ছাল চামড়া ওঠা কম্বল বুঝিবা কেউ মুখের ওপর ঝেড়ে দিচ্ছে।

যাই হোক এই লোকগুলোই আমার সমব্যথী ছিল। কিন্তু কেবল ওরাই। জেলার, কারারক্ষীরা, জেলের চাবি যার হাতে থাকে সে, সবাই ওরা আমারই সামনে আমাকে

BanglaBook.org

নিয়ে এমন হাসি মস্করা করতো যে মনে হতো আমি বুঝি মানুষপদবাচ্যই নই, যেন একটা অসার বস্তুমাত্র।

৬.

আমি মনে মনে ভাবলাম

আমার যখন লেখার, ক্ষমতা আছে তখন আমি লিখবো নাই বা কেন? কিন্তু লিখবোটা কী? ঠান্ডা পাথরের চার দেওয়ালের মধ্যে আমি যে বন্দি। আমার চলাটুকুও যে সীমাবদ্ধ। তাকাবার মতো আকাশও যে ওরা আমার জন্য রাখেনি। দিনের বেলায় আমার সময় কাটানোর একমাত্র উপায় ছিল এরকম। দরজার ওপরের ছোট্ট জানালাটা যে বর্গক্ষেত্রটা তৈরি করতো আমার উল্টো দিকের পাথরের কালো দেওয়ালের ওপর সেটাকে দেখা। শুধু লক্ষ করা কেমন করে সেই বর্গক্ষেত্রটা ক্রমেই সরে সরে যাচ্ছে। এভাবেই বড় নিঃসঙ্গ দিন কাটাতাম শুধু একটি ভাবনাকে সঙ্গী করে। যে সঙ্গীর নাম অপরাধ ও শাস্তি, খুন ও মৃত্যু। অবশ্য আমার মতো একটা মানুষের জন্যে আর কিই-বা থাকতে পারে যার এই বিশাল পৃথিবীতে আর কোনো কাজই করার নেই! এই ঘৃণ্য ও শূন্য মস্তিষ্কে আমি আর কিই-বা খুঁজে পাবো যা লেখার যোগ্য হবে?

কিন্তু যেটুকু খুঁজে পাবো সেটুকুই বা কেন লিখে রাখবো না? যদিও আমার গোটা ইতিহাসটাই অত্যন্ত বিবর্ণ এবং এর সবটাই এখন ভেবে নেওয়া যায়। তবু আমার মধ্যেও কি ঝড়, দ্বন্দ্ব ও শোকের সংকেত নেই? আবিষ্ট করে রাখা কোনো এক ধারণা যেটা তার মুঠোর মধ্যে আমাকে বন্দি করে রেখেছে সেটা কি প্রতি মুহূর্তে, প্রতি ঘণ্টায় আমার সামনে নতুন নতুন রূপে প্রকটিত হয় না এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি ভয়াবহ, আরো বেশি রক্তাক্ত হয়ে ওঠে না যতই আমার শেষ দিনটি ক্রমাগত কাছে, আরো কাছে এগিয়ে আসতে থাকে? এই হতাশ ও হাল ছেড়ে দেওয়া অবস্থায় আমি যেসব অদ্ভুত অনুভূতি উপলব্ধি করি সেগুলোই বা কেন আমি নিজের কাছেই নিজে বর্ণনা করবো না? যদিও আমার জীবন বলতে খুব একটা আর বেশি বাকি নেই তবু যেটুকু আছে সেটুকুর মধ্যেও তো রয়েছে শরীর মনের অশেষ যন্ত্রণা, ভয় আর নির্মম অত্যাচারের কথা ও কাহিনী যেগুলো শেষ ঘণ্টা অবধি লিখতে থাকলে আমি নিশ্চিত যে আমার এই কলম অবধারিতভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। শুকিয়ে যাবে কালির দোয়াতও। এবং যেহেতু এইসব মানসিক যন্ত্রণা খানিকটা প্রশমনের একমাত্র উপায় হলো ওদের নিয়ে চিন্তা করা সুতরাং ওদের লিখে ফেলতে পারলে বোধহয় এই যন্ত্রনাকাতর মনটা একটু হালকা হয়।

উপরন্তু, আমার লেখাটা বোধহয় খুব একটা অপ্রাসঙ্গিকও হবে না। আমার যদি ততক্ষণ পর্যন্ত এই ডায়েরি লিখে যাওয়ার শক্তি থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই হাতকে জোর করে শেষবারের মতো থামিয়ে না দেওয়া হয় তাহলে এই বিবরণীতে থাকবে আমার প্রতি ঘন্টার, প্রতি মুহূর্তের, প্রতিটি নির্যাতন, প্রতিটি যন্ত্রণার আশ্চর্য

BanglaBook.org

বিবরণ। আমার সব অনুভূতির, আমার সব অসম্পূর্ণ অথচ প্রয়োজনীয়তার অতি নিখুঁত বর্ণনা কি তাহলে একটা সৎ উদ্দেশ্যে লিখিত মহান অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হবে না? যে মনটা মরে যাচ্ছে তার শেষ আক্ষেপের এই প্রতিলিপিতে, ক্রমশ বেড়ে চলা যন্ত্রণা, একটা মাথা যেটা ভাবতে জানে সেটাকে কেটে ফেলা, এইসবের মধ্যে নিশ্চয়ই তথাকথিত বিচারকদের জন্য অনেক ভাবনা চিন্তার খোরাক রয়ে যাবে। এই প্রতিলিপি পড়ার পর ওঁরা কি এক চিন্তাশীল মস্তিষ্ককে দ্বিখণ্ডিত করার আগে একটুও থমকাবেন না? একটি মানুষের মাথা—বিচারের শেষ মাপকাঠি! কিন্তু দণ্ডিতের ক্রমবর্ধমান নির্যাতনের কথা কি ওনারা কোনোদিন ভেবে দেখেছেন? এমন চিন্তা কি তাঁরা কোনোদিন করেছেন যে তাঁরা যে মানুষটিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন তার মন তখনো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত নয়? সেই চিন্তাশীল মানুষটির তখনো বাঁচার অধিকার ফুরিয়ে যায় নি? না ওনারা সেকথা ভাবেন নি। বরং ওঁরা এমনটাই ভেবেছেন যে দণ্ডিত মানুষটির অতীত বলতে কিছু নেই আর ভবিষ্যৎও না। ওনাদের চোখ তাই গাঢ় নিবদ্ধ থেকেছে একটি ত্রিকোণাকৃতি ধারালো ফলকের লম্বালম্বি পতনের পথরেখায়।

কিন্তু এই পাতাগুলো তাঁদেরও ভাবতে বাধ্য করবে। যদি কোনোদিন এগুলো ছাপা হয়ে বের হয় তাহলে সাধারণ মানুষ এগুলো পড়তে পড়তে নিশ্চয়ই এর মধ্যে দণ্ডিতের মানসিক নির্যাতন সহ্যের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে কারণ এই বিষয়টি যে তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আইনের রক্ষকরা গর্ব অনুভব করেন এই ভেবে যে তাঁরা প্রায় কোনো প্রকার যন্ত্রণা না দিয়েই এক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীকে হত্যা করতে পারেন। হা ঈশ্বর! কেমন করে ওনারা এটা ভাবেন! মানসিক যন্ত্রণার কাছে শারীরিক যন্ত্রণা আর কতটুকু! ঈশ্বরের দোহাই, বলুন এমন আইন কি থাকা উচিত? সেইদিন হয়তো আর বেশি দূরে নয় যেদিন আশা করি হয়তো এই লেখাগুলো পড়েই...
যা একজন দণ্ডিতের শেষ কিছু কথা...

৭.

কিন্তু কে বলতে পারে যে, আমার মৃত্যুর পর বাতাস এসে এই পাণ্ডুলিপিগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে জেলের কর্দমাক্ত চত্বরে ফেলবে না? অথবা কোনো কারারক্ষীর জানালার ফুটো বন্ধ করার কাজে লাগবে না? হয়তো সেখানে সেই অবস্থায় থাকতে থাকতে বর্ষার জলে এগুলো পচে যাবে। আমি যা লিখে যাবো তা কি অন্যের কোনো কাজে আসবে? জজ সাহেব তাঁর চরম রায় শোনাবার মাঝখানে কি থামবেন একবারও? অন্য হতভাগ্য দণ্ডিতদের জীবন, যে মৃত্যুযন্ত্রণা আমি দিনের পর দিন ভোগ করছি তার হাত থেকে কি রেহাই পাবে—তা তারা দোষী বা নির্দোষ যাই হোক না কেন? কিন্তু তাতে কি? আমি কেন চিন্তা করবো? কী লাভ আমার? যখন আমার কাটা মাথাটা মাটিতে গড়াগড়ি খাবে তখন তাঁরা অন্যদের মাথা কাটার

BanglaBook.org

আদেশ দিলেন কি দিলেন না তাতে আমার কি-ই বা এসে যাবে? কিন্তু এমন হঠকারী ভাবনা কি আমি আদৌ ভাবতে পারি যে নিজে ওপরে উঠে যাওয়ার পর মইটাই ভেঙে দেবো। তাহলেও জানতে ইচ্ছে করে আমার চলে যাওয়ার পর এই সূর্য, বসন্ত ঋতু, ফুলের মাঠ, ভোর বেলায় পাখিদের কাকলি, মেঘেদের দল, গাছেরা, প্রকৃতি, স্বাধীনতা, জীবন—এরা কি সত্যিই আর আমার থাকবে না?

তাই বা কেন! আমাকে ক্ষমা করা দিয়েও তো ওরা শুরু করতে পারে! নাকি এটাই সত্যি যে আমার আর কোনো আশাই নেই। কাল আমাকে মরতেই হবে অথবা হয়তো আজই। কোনদিনটা ঠিক করা আছে বলবেন? হা ঈশ্বর! এই দুশ্চিন্তাটাই এত নির্যাতন করে চলে সারাক্ষণ যে মনে হয় আপনার কাছেই আর্জি জানাই যে আপনি নিজের হাতে কারাগৃহের মধ্যেই ওঁদের হয়ে কাজটা শেষ করে দিন।

৮.

আর আমার কি বাকি আছে এবার হিসেব করা যেতে পারে;

রায় বের হওয়ার পর আপিল করবো কি করবো না তার জন্য মাত্র তিনদিনের ছাড়।

কোর্ট অফিসের কেরানির কাছে সপ্তাহখানেক পড়ে থাকার পর আমার 'কাগজপত্তর'গুলো, সেরকমই বলে ওরা, মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। যদিও সপ্তাহ দুয়েক সেগুলো সেখানে পড়ে থাকে তবু সেগুলোর অস্তিত্ব নিয়ে কেউই সেখানে মাথা ঘামায় না। অথচ আপিল করার জন্য নির্দিষ্ট কোর্টে সেগুলোকে মিলিয়ে দেখে পাঠাবার কথা মন্ত্রণালয়েরই।

সেই কোর্টে কাগজপত্রগুলো ফাইল করে ক্রমিক নম্বর ফেলে নথিভুক্ত করা হয়। গিলোটিনের আপাতত ভীষণ কাজের চাপ চলছে। সুতরাং নম্বর না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা তোমাকে করতেই হবে।

নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরো দু'সপ্তাহ যাতে অন্য কেউ তোমাকে টপকে বেলাইনে না ঢুকে পড়ে। সবশেষে কোর্টের কাজ শুরু হয়। সাধারণত কোনো এক বৃহস্পতিবারে। কুড়িখানার মতো আপিল একসঙ্গে নাকচ করা হয়। তারপর সেগুলো মন্ত্রীর কাছে ফিরে যায়। সেখান থেকে এটর্নি জেনারেলের কাছে। সবশেষে ঘাতকের কাছে। সব মিলিয়ে তিনদিন।

চতুর্থ দিনের সকালে এটর্নি জেনারেলের ঠিক অধস্তন কর্মচারীটি তাঁর টাই বাঁধতে বাঁধতে ভাবেন—'ব্যাপারটাকে আমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার।' সুতরাং তারপর কোর্টের কেরানীটির যদি কোনো পূর্বনির্ধারিত দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের নিমন্ত্রণ না থাকে তাহলে হত্যার আদেশনামাটির খসরা তৈরি হয়। ভুল টুল কিছু থাকলে তা সংশোধন করে আবার নতুন করে লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর ঠিক তার পরদিন সকাল থেকেই প্লেস দ্য গ্রীভ-এ ছুতোর মিস্ত্রীদের কাঠ দিয়ে ফাঁসির

BanglaBook.org

মঞ্চ তৈরির শব্দ শোনা যায়। আর শোনা যায় ড্রাম বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণাকারীর কর্কশ গলার শব্দ যাতে হত্যার দিন সব লোক হাজির হয়।

সব মিলিয়ে ছ'সপ্তাহ। মেয়েটি মোটেও ভুল বলেনি।

যাইহোক, প্রায় পাঁচ সপ্তাহ মতো হলো আমিই তো বিসেথ্রে-এর এই কুঠরিটাতে বন্দি জীবন যাপন করছি। অবশ্য ছ'সপ্তাহও হতে পারে। কারণ ইদানীং দিন গুনতে আমার ভীষণ ভয় করে। আমার মধ্যে একটা গোপন সন্দেহ বাসা বেঁধেছে যে বোধহয় তিনদিন আগের দিনটাই ছিল বৃহস্পতিবার।

৯.

আমি এইমাত্র আমার ইচ্ছেটাকে লিখে রাখলাম।

কী কারণে? আরে বাবা, অনেক খরচাপাতির পর আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে আর যা কিছু আমার আছে তা কোনোমতেই বেশি কিছু নয়। গিলোটিনের দাম যে অনেক!

আমি পেছনে ফেলে এসেছি একজন বৃদ্ধা মা, একজন স্ত্রী এবং একটি শিশুসন্তানকে। তিন বছরের ছোট্ট একটা মেয়ে। নরম সরম, লাল টুকটুকে গাল, ভীষণ কমনীয়, বড় বড় কালো হরিণ চোখ আর একমাথা লম্বা বাদামি চুল ওর।

ও যখন দু'বছর এক মাসের ছিল তখনই আমি ওকে শেষ দেখেছি। *তাহলে আমার মৃত্যু তিনটি মেয়েকে পিছনে রেখে যাবে যাদের মধ্যে একজন হবে পুত্রহীন, একজন স্বামীহারা আর অন্য আরেকজন পিতৃহারা। আর এভাবেই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওরা হবে আপনাদের তথাকথিত ন্যায়বিচারের আইন কর্তৃক সৃষ্ট তিন অনাথা।*

BanglaBook.org

আমি স্বীকার করছি যে আমার নাহয় ঠিক শাস্তিই হয়েছে। কিন্তু এই তিনজন কোন অপরাধে অপরাধী বলতে পারেন? আর কি! এবার তো ওদের পদে পদে অসম্মানিত হতে হবে, ধ্বংসের পথে নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যেতে হবে। বাহ্ কি অপূর্ব আপনাদের বিচার!

আমার হতভাগী বৃদ্ধা মা'র কথা ভাবি না। ওনার এখন চৌষট্টি। হয়তো আমার শোকই ওনাকে মেরে ফেলবে। অথবা হয়তো কোনোরকম নালিশ কারো বিরুদ্ধে না জানিয়ে উনি ক'টা দিন আরো টিকে যাবেন যদি পায়ের সেঁকটার বন্দোবস্ত ঠিকঠাক থাকে।

আমার স্ত্রীর কথা ভেবেও আমি ভয় পাই না। ওর তো একেই শরীর খুব খারাপ। তার ওপর আবার মানসিক জোরটাও একেবারেই হারিয়ে গেছে। সুতরাং বৌ-টাও মরে যাবে একান্তই যদি না সে পাগল হয়ে যায়। লোকে বলে পাগলেরা নাকি অনেকদিন বাঁচে। মনটা মৃত্যুর মতো ঘুমিয়ে পড়ার সুবাদে আর যাই হোক নির্যাতনের শিকার হয়ে তিলে তিলে সে মরে না।

কিন্তু হতভাগী মেয়েটার চিন্তা আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। আমার বেচারি ছোট্ট কুঁড়ির মতো মেরী। অজ্ঞতার আশীর্বাদে ও এখনো হাসছে, খেলছে, গান গাইছে। ওর ভাবনা আমার কাছে, ঈশ্বর জানেন, সত্যিই এক অপরিসীম নির্যাতন।

১০.

আমার কয়েদখানাটা হলো মোটামুটি এইরকম।

আট বাই আট। সিলিং থেকে সমানভাবে পাথরের দেওয়াল নেমে এসেছে মেঝে অবধি। মেঝেটা করিডরের উচ্চতার চেয়ে একধাপ মতো বেশি। ঢোকার মুখে দরজার ডান দিকে খুব ছোট্ট একটা জায়গা যেন একটা কুলুঙ্গী না করতে পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার মতো। মেঝেয় একবোঝা খড় বিছানো। ওইখানেই কয়েদীকে বিশ্রাম নেওয়ার অথবা ঘুমাবার বন্দোবস্ত করে নিতে হয়। পরিধান? ক্যাম্বিসের, সঙ্গে একটা টুইলের জ্যাকেট—তা সে শীত গ্রীষ্ম যাই হোক না কেন। মাথার ওপর অবশ্যম্ভাবীভাবেই আকাশ নয়, একটা অন্ধকার সিলিং, গথিক ভল্টের স্টাইলে, যেখান থেকে মাকড়সার মোটা মোটা জাল ঝুলছে ছেঁড়া খোঁড়া ফিতের মতো।

আর কি কি আছে? একটাও জানালা নেই। নাহ্, কোনো স্কাইলাইটও না। শুধু লোহা বাঁধান একটা দরজা। অবশ্যই এটাই সব নয়, দরজার ওপর দিকে মাঝামাঝি জায়গায় ন'ইঞ্চি বর্গক্ষেত্রাকৃতি একটুকরো উন্মুক্ততা। আড়াআড়ি লোহার রড দেওয়া তাও। যেটা রাতে কারারক্ষী বন্ধ করে দিতে পারে।

বাইরে লম্বা একটা করিডর যেখানে আলো বাতাস ঢোকে দেওয়ালের অনেক উঁচুতে তৈরি স্কাইলাইটের মধ্যে দিয়ে। করিডরটা আবার ইটের তৈরি ছোট ছোট কামরায় বিভক্ত যারা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে সারি সারি ছোট ছোট নিচু খিলান দেওয়া দরজার মাধ্যমে। এইসব কামরাগুলোকে আমি যে ঘরে থাকি সেইরকম ঘরের অ্যান্টিরুম বলে। অভব্যতার কারণে জেলখানার গভর্নর-এর আদেশে কয়েদীদের এইসব কামরাগুলোয় সহবত শেখাবার জন্য রাখা হয়। প্রথম তিনটে কামরা সংরক্ষিত সেইসব কয়েদীদের জন্য যারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। ওগুলো লজ-এর কাছাকাছি এবং প্রধান কারারক্ষীর সুবিধার কথা ভেবেই এই সংরক্ষণ।

আগেকার সঁত দ্য বিসেত্রে-এর স্মৃতি বলতে ওই সেলগুলোই যা আছে কারণ পনেরোশত শতাব্দীতে কার্ডিনাল অব উইনচেষ্টার যিনি জোয়ান অব আর্ক-কে পুড়িয়ে মেরেছিলেন তিনিই এটা তৈরি করিয়েছিলেন। এ গল্প আমি শুনেছিলাম যখন ভ্রমণার্থীদের এটা বলা হচ্ছিল, যাদের গতকাল আমাকে দেখার জন্য পাশের অ্যান্টিরুমে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ওরা সবাই আমার দিকে এমন করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল যেন আমি একটা সার্কাসের জন্তু। ওরা যে কারারক্ষীকে একটা পাঁচ-ফ্রাঙ্সের নোট দিল সেটাও আমার নজর এড়ায় নি।

BanglaBook.org

ওহ হো, বলতেই ভুলে গেছি যে আমার সেলের সামনে দিন রাত্তির কঠিন চোখের পাহারাদার থাকতো যাতে তাদের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে আমার চোখ দরজার ঘুলঘুলি দিয়ে এদিক ওদিক না তাকাতে পারে।

আলো হাওয়ারা অনেক পরিশ্রম করে এই পাথুরে কয়েদঘরে ঢুকতে পারে। দিনের আলো ফুটতে দেরি থাকলে রাত কাটাবার জন্যে কিছু তো করা দরকার! মাথায় একটা মতলব এলো। উঠে বসে আমার লণ্ঠনের আলোটা কুঠরির চার দেওয়ালে ফেলে ফেলে খেলতে শুরু করলাম। দেওয়ালগুলো লেখায় লেখায়, ছবিতে ছবিতে, কিম্ভূত সব প্রতিকৃতিতে ও নামে নামে ভর্তি, যেগুলো আবার একটা আরেকটার ঘাড়ের ওপর দিয়ে লেখা। দেখে মনে হবে যে প্রতিটি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী তাদের স্মৃতিচিহ্ন এইখানে, ঠিক এইখানে, রেখে যেতে চেয়েছিল। পেন্সিলে, চকে বা কাঠকয়লায় লেখা অক্ষরগুলো কোনোটা কালো, কোনোটা সাদা অথবা কোনোটা ধূসর। পাথর খোদাই করা লেখাও কিছু ছিল। এছাড়া এখানে সেখানে জং-রঙের লেখাগুলো মনে হয় রক্ত দিয়ে লেখা। ওফ্, যদি আমার মনটা একটু স্বস্তিতে থাকতো তাহলে এই আশ্চর্য বইটা, যার পাথরের পাতাগুলো আমার চোখের সামনে একটা একটা করে উল্টে যাচ্ছে আমার লণ্ঠনের আলোকরশ্মির আঘাতে, নিশ্চয়ই আমাকে সম্মোহিত করে রাখতো। তাহলে আমার ভীষণ ভালো লাগতো পাথরের ওপর এঁকে যাওয়া এইসব টুকরো টুকরো বিদ্যুৎ চমকের মতো চিন্তাগুলোকে জোড়া লাগাতে আর প্রতিটি নামের পিছনে হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে আবার ফিরিয়ে আনতে। এইসব ছিন্নভিন্ন সইগুলোর বুকে জীবনের প্রশ্বাস ও মানে ফিরিয়ে দিতে। এইসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন চিন্তা ও টুকরো কথাগুলোকে ঠিক তাদেরই মুণ্ডুহীন ধড়ের মতো লাগছে যারা ওদের এঁকেছে ও লিখেছে।

যেদিকে মাথা রেখে শুই ঠিক তার সোজা, যেখানে চোখ দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে, সেখানে দুটো জ্বলন্ত হৃদয়ের ছবি আঁকা যাদের ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে একটা তীর এবং ঠিক তার ওপরে লেখা মৃত্যু যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের আলাদা করে দিচ্ছে। এই ভাগ্যহতটি কোনো দীর্ঘ প্রতিজ্ঞা ট্রতিজ্ঞা করার দিকে যায়নি। এটার পাশেই কোনোমতে আঁকা একটা তিন-শিং-ওয়ালা টুপি আর তার নিচে ছোট্ট মুখটাও কাঁচা হাতের কাজ। নিচে লেখা সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন, ১৮২৪।

এগুলোর ওপরে, আশেপাশে, নিচে আরো অনেকগুলো জ্বলন্ত হৃদয়ের ছবি আর এই ধরনের লেখা অর্থাৎ জেলখানায় যেমন থাকে আর কি "ম্যাথু ড্যানভিনকে আমি আমৃত্যু ভালোবাসবো, পুজো করবো।" –জ্যাকি

১১.

এর উল্টোদিকের দেওয়ালে পাপাভয়্যাঁ[৯] নামটা বেশ ভালোই পড়া যায়। আদ্য-অক্ষর "P"টা আরবী কায়দায় বেশ সুন্দর করে লেখা।

এর নিচে একটা নোংরা গানের দুটো লাইন।

পাথরে খোদাই করা রয়েছে একটা প্রিজিয়ান টুপির প্রতিকৃতি। নিচে লেখা বোরিস। দ্য রিপাবলিক, লা রোচেল-এর চারজন সার্জেন্টের মধ্যে সে ছিল একজন। হতভাগ্য যুবক! একটা অলীক রাজনৈতিক ধারণার প্রতি কি ভয়ংকর উৎসর্গীকৃত প্রাণ ছিল ওরা, যখন সেই ধারণা, সেই স্বপ্ন, সেই একাগ্র চিন্তার পুরস্কার ছিল এই নির্মম সত্য গিলোটিন। অন্যদিকে আমাকে দেখুন। আমি তো একটা সত্যিকারের অপরাধ করেছি যখন অনেক রক্তপাতও হয়েছে। এমতাবস্থায় আমার তো নিজের প্রতি নিজেরই করুণা হচ্ছে।

নাহ্ আর আমি দেখবো না এইমাত্র আমি দেখেছি, দেওয়ালের কোণে চকখড়ি দিয়ে আঁকা ভয়ানক এক ছবি। এক মঞ্চের মতো। এই মুহূর্তে হয়তো ওইরকমই একটা মঞ্চ আমার জন্যেও তৈরি হচ্ছে কিনা তা কে বলতে পারে! নিদারুণ একটা ভয়ে লণ্ঠনটা প্রায় আমার হাত থেকে পড়ে গেছিল আর কি!

১২.

আমি তাড়াতাড়ি আমার খড়ের বিছানায় ফিরে গিয়ে দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজলাম। তারপর আমার শিশুসুলভ ভয় এক বিকৃত ইচ্ছের কাছে নতি স্বীকার করে আবারও আমাকে দেওয়ালের লেখাগুলো পড়ে যেতে বললো। পাপাভয়্যাঁ নামটার পাশ থেকে ধূলিধূসর ও ঘরের কোণা অবধি বিস্তৃত একটা মাকড়সার ঝুল ছিঁড়ে নামালাম। এই ঝুলের নিচে, অন্যান্য অনেক নামের মধ্যে, যেগুলোকে দেওয়ালের ওপর ময়লা দাগ ছাড়া অন্য কিছু মনে হচ্ছিল না, শুধু পরিষ্কারভাবে পড়া যাচ্ছিল চার পাঁচটা নাম। দাউতুঁ ১৮১৫, পওলিন ১৮১৭, জ্যাঁ মার্টিন ১৮২১, কঁস্তা ১৮২৩। এই নামগুলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ স্মৃতিরা মনের আয়নায় ভেসে উঠলো দাউতুঁ—এই লোকটি তার ভাইকে চার টুকরো করে কেটে মাথাটা একটা ঝর্নায় আর দেহের অন্যান্য অংশগুলো নর্দমায় ফেলে দিয়ে সারারাত প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছিল। পওলিন তো ওর নিজের বৌকেই খুন করেছিল। জ্যাঁ মার্টিন তার বুড়ো বাবা যখন একটা জানলা খুলছিল তখন তাকে গুলি করে মেরেছিল। আর কঁস্তা, ডাক্তার হওয়ার সুবাদে, তার বন্ধুকে বিষ খাইয়েছিল ও তারপর চিকিৎসার জন্য নিজের কাছে নিয়ে এসে তাকে প্রতিষেধক দেওয়ার বদলে আরো বেশি বিষ প্রয়োগ করে খুন করেছিল। এদের ছাড়া, পাপাভঁয়্যা, যে ছিল ভয়ংকর এক উন্মাদ, সে তো ছোট ছোট বাচ্চাদের মাথায় ছুরি ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে মেরে ফেলতো।

এদের কথা ভাবতেই আমার সর্বাঙ্গে একটা ভয়ের শিহরণ জেগে উঠলো। উরি বাবা! এইসব ভয়ানক লোকগুলো তাহলে আমার আগে এই ঘরেরই বাসিন্দা ছিল! এখানে, এই ঘরটারই মেঝেতে বসে তাহলে ওইসব রক্তপিপাসু খুনীগুলো তাদের জীবনের শেষ চিন্তা ভাবনা করেছিল? বুনো পশুর মতো এই চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি হয়ে ওরা হয়তো পাগলই হয়ে গেছিল। ওরা একের পর এক বেশ অল্প

BanglaBook.org

সময়ের ব্যবধানেই এই ঘরে ঢুকেছিল। কথিত আছে এই কুঠরিটা নাকি বেশিদিন খালি পড়ে থাকে না। যাইহোক ওরা এই জায়গাটা গরম করে রেখেছে এবং রেখেছে আমারই জন্যে। ওদের এঁকে যাওয়া পদচিহ্ন ধরে আমিও এগিয়ে চলবো সমাধিস্থ হওয়ার উদ্দেশ্যে ক্ল্যামার্ট-এ যেখানে ঘাসের রঙ খুব সবুজ!

আমি কোনো স্বপ্ন বা কুসংস্কারে বিশ্বাসী মানুষ নই। যদিও আমার চিন্তাগুলোই আমাকে বেশ খানিকটা অসুস্থ করে তুলছে। কারণ যখন আমি চিন্তা করছিলাম তখন হঠাৎই আমার মনে হয়েছিল যে এই ভয়ংকর নামগুলো আগুনের অক্ষরে লেখা হয়েছে কালচে দেওয়ালের ওপর। আমার কানদুটো যেন এক ক্রমবর্ধমান বাজনার আওয়াজে ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছিল; একটা লাল রঙের পর্দা যেন আমার চোখের সামনে ঝুলছিল। আর ঠিক তক্ষুণি হঠাৎই যেন আমি অনুভব করেছিলাম যে আমার কুঠরিটা অচেনা লোকেদের মিছিলে যেন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে যারা তাদের নিজেদের মাথাগুলো বাঁ হাতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ওরা মাথাগুলোর হাঁ মুখ চেপে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। মাথাগুলো কামানো ছিল ইঙ্গিতবাহীভাবেই। ওরা প্রত্যেকেই আমাকে ওদের ডান হাতের ঘুষি দেখিয়েছিল। শুধু সেই লোকটি ছাড়া যে নিজে তার বাবাকে খুন করেছিল।

আমি ভীষণ ভয়ে দু'চোখ বন্ধ করেছিলাম। হয়তো বা সেইসব দৃশ্যগুলোকে আরো পরিষ্কারভাবে দেখার জন্যই।

এটা স্বপ্ন, অলৌকিক দর্শন অথবা বাস্তব ঘটনা—যাইহোক না কেন, আমি মনে করি যে সেসময় আমি নিশ্চিত পাগল হয়ে যেতাম যদি না অকস্মাৎ একটা অনুভূতি আমাকে সময়মতো জাগিয়ে তুলতো। আমি যখন প্রায় পেছনে টলে পড়ে যাচ্ছি ঠিক তক্ষুণি আমার নজরে এলো যে একটা ঠান্ডা পেট ও লোমশ ক'টা পা আমার নিরাবরণ পায়ের পাতা বেয়ে উঠছে। অর্থাৎ যে মাকড়সাটাকে আমি বিরক্ত করেছি সেটাও হয়তো আমারই মতো মুক্তি খুঁজছে।

আর এই দৃশ্যটাই আমাকে আমার সম্বিত ফিরিয়ে দিল। অর্থাৎ যা দেখলাম সেগুলো কোনোমতেই কিন্তু ভয়ানক অলৌকিক বা ভুতুড়ে কাণ্ড ছিল না। বরং বলা যেতে পারে ওগুলো ছিল পরিশ্রমকাতর এক মগজের কষ্ট-কল্পনার ধোঁয়াশা মাত্র। একটা ম্যাকবেথিয়ান মিছিল! যারা মৃত তারা মৃতের বেশি এক চুলও নয়। ওদের সব্বাইকে সমাধিস্থলে নিপুণভাবে তালাবদ্ধ করে রাখা আছে। সেটা কিন্তু কোনো কয়েদখানা নয় যে সেখান থেকে কোনোভাবে পালানো সম্ভব। তাহলে ওদের আমি মিছিমিছি কেন এত ভয় পাচ্ছি?

সমাধির কোনো দরজাই ভেতর থেকে খোলা যায় না।

১৩.

কয়েকদিন আগে আমি একটা ভয়ানক দৃশ্য দেখেছিলাম। তখনো ভোরের আলো ফোটেনি। কিন্তু জেলের মধ্যে প্রচণ্ড শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভারী লোহার

BanglaBook.org

দরজাগুলো খোলা ও বন্ধের আওয়াজ, তালা ও ছিটকিনিগুলোর আর্তনাদ, কারারক্ষীর বেল্টে চাবির গোছার ঝনঝনানি, সিঁড়ির ওপর থেকে নিচু অবধি ভারী বুটের চাপে কেঁপে কেঁপে ওঠা লম্বা করিডরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত চিৎকারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল ভীষণ জোরেই। আমার প্রতিবেশী কয়েদীরা যারা নির্জন বন্দিদশা যাপন করছিল তারাও অন্য দিনের তুলনায় বেশ খোশ মেজাজে আছে মনে হচ্ছিল। বিসেথ্রে-র সমস্তটাই মনে হচ্ছিল হাসছে, গাইছে, দৌড়াচ্ছে আর নাচছে। এহেন বিশাল এই পাগলখানায় যে মানুষটি একা এই বিশৃঙ্খলার মাঝে দাঁড়িয়ে বড় বড় অবাক চোখে সবকিছু দেখছিল সে আমি ছাড়া আর কেউ না।

একজন কারারক্ষীকে সামনে দিয়ে যেতে দেখে আমি তাকে সাহস করে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম যে, জেলের এটা ছুটির দিন কি না।

'ইচ্ছে করলে তুমি ওরকমটাও বলতে পারো!' সে উত্তর দিল। 'আজ সেইসব কয়েদীদের লোহার বেড়ি পরানো হচ্ছে যাদের কাল তৌলু-তে পাচার করা হবে। গোটা ঘটনাটা দেখার ইচ্ছে হলে দেখতে পারো। কারণ ব্যাপারটা দর্শনীয়ই বটে।

অন্যদিকে মনটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো কোনো ঘটনা তা সে যতই ন্যক্কারজনক হোক না কেন, এক কয়েদীর নির্জন বন্দিবাসে নিঃসন্দেহে সেটা আমন্ত্রণযোগ্য। সুতরাং তাকিয়ে থাকার জন্য তার প্রস্তাব আমি গ্রহণই করলাম।

কারারক্ষী প্রচলিত সাবধানতা অবলম্বন করলো যাতে আমি পালাতে না পারি। তারপর সে আমাকে একটা ছোট্ট কুঠরিতে নিয়ে গেল যেখানে কোনো কয়েদী ছিল না। এটাতে একটা লোহার গরাদ দেওয়া জানালা ছিল। অবশ্য তার মানে এই নয় যে তুমি তোমার কনুই-এ ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে আর জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখতে পাবে।

'এখান থেকে তুমি সবকিছু দেখতে ও শুনতে পাবে'—সে বললো। 'এখানে তোমার একলার একটা জায়গা রইলো, রাজা মহারাজাদের যেমন থাকে আর কি!'

তারপর সে মোটা মোটা লোহার ছিটকিনিগুলো এঁটে দিয়ে তালার পর তালা লাগিয়ে চলে গেল।

জানালার ফাঁক দিয়ে একটা বিশাল চৌকো চত্বর নজরে এলো যার সবকটা দিকই ছ'তলা উঁচু পাথরের বাড়ি দিয়ে ঘেরা। লোহার গরাদ ঘেরা চারপাশের এই বাড়িগুলোতে অসংখ্য জানলা। সেগুলোকে এত দৃষ্টিকটু লাগছিল যে বলে বোঝানো যাবে না। ওপর থেকে নিচু অবধি জানলায় জানলায় আড়াআড়ি গাঁথা লোহার গরাদগুলোর মধ্যে শত শত দুর্বল, বিবর্ণ মুখগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন দেওয়ালে গাঁথা এক একটি ইঁট। এরা প্রত্যেকেই কয়েদী। তবে আজ এরা সবাই দর্শক। তবে প্রত্যেকেই কোনো ভয়ংকর জিনিসের মুখোমুখি হওয়ার প্রতীক্ষায়। ওদের প্রত্যেককেই যেন প্রেতলোকের জানালা দিয়ে নরকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা অভিশপ্ত আত্মার মতো লাগছিল।

BanglaBook.org

সকলেই ওরা নীরবে শূন্য চত্বরটার দিকে তাকিয়ে। এইসব নিদারুণ বিমর্ষ ও বিবর্ণ মুখের মিছিলে দু-একটা চোখ এখানে ওখানে ভীষণ উদগ্রীব, ভীষণ জীবন্ত হয়ে বিদ্যুৎ চমকের মতো জ্বলছিল।

জেলের চারপাশ জুড়ে তৈরি বাড়িটা অবশ্য পুরোপুরি বন্ধ ছিল না। বাড়িটার চারটি শাখার মধ্যে পূর্বদিকেরটার মাঝখানে একটা খোলা জায়গা আর সেই খোলা জায়গাটা পাশেরটার সঙ্গে একটা লোহার গেটের মাধ্যমে সংযুক্ত। এই গেটটার মধ্য দিয়ে আর একটা চত্বরে যাওয়া যায়। এই চত্বরটা প্রথমটার চেয়ে ছোট হলেও ওটার মতোই চারপাশ দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। প্রধান চত্বরটার চারপাশে দেওয়াল ঘেষে তৈরি করা আছে অনেক পাথরের বেঞ্চি। আর তার মাঝখানে রয়েছে খিলান দেওয়া একটা ধাতব দণ্ড যাতে লণ্ঠন-ঘড়ি ঝোলানো যায়।

ঘড়িটা দুপুর ঘোষণা করতেই দেওয়ালের আড়ালে লুকানো বিরাট একটা প্রবেশপথ খুলে গেল হঠাৎ এবং সেখান থেকে একটা বড় ওয়াগন বেরিয়ে এলো। যেটাকে পাহারা দিতে দিতে নিয়ে আসছিল নোংরা ও দুর্বৃত্তদের মতো দেখতে কিছু সৈন্যসামন্ত যাদের পরনে ছিল নীল পোশাক, কাঁধে লাল রঙের মলিন বাহারি সাজ এবং হলুদ পট্টি লাগানো তাতে। ওয়াগনটা ঝন ঝন করে ধাতব আওয়াজ করতে করতে এসে চত্বরে থামলো। ওরা কয়েদীদের জন্য চেনগুলো বয়ে নিয়ে এলো।

ঠিক তক্ষুণি সমস্ত জেলখানাটায় একটা যেন তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। জানলায় মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার হাজার কয়েদীরা যেন বুঝি এই মুহূর্তটার অপেক্ষাতেই ছিল। হয়তো ওদের এই উৎসাহটুকুরই প্রয়োজন ছিল। জানলায় জানলায় দাঁড়িয়ে থাকা কয়েদীগুলো যারা এতক্ষণ নীরব, নিঃস্পন্দ ছিল তারা বাঁধভাঙা আনন্দে ফেটে পড়লো। ওদের মধ্যে কেউ কেউ পাগলের মতো গান শুরু করলো। কেউ শপথ নিতে ও তর্জনী তুলে শাসাতে শুরু করলো যার শব্দ হায়েনার হাসির মতো ওদের হাসি গানের আওয়াজের সঙ্গে মিলে মিশে এক ঐক্যতানের সৃষ্টি করলো। ওফ্, ওই বীভৎস আওয়াজ শুনতে এত খারাপ লাগছিল! ওদের মুখগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওরা শয়তানের মুখোশ পরে আছে। নানারকম মুখভঙ্গি করার জন্য ওদের মুখগুলোই বেঁকে গিয়েছিল, ওদের মুঠো করা হাতগুলো গরাদের ফাঁক দিয়ে উঠে ছিল। প্রত্যেকেই ওরা এক একটা ষাঁড়ের মতো চিৎকার করে চলছিল। প্রত্যেকের চোখেই ধ্বক ধ্বকে আগুনের ফুলকি ঠিকরে বের হচ্ছিল দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবলাম—ছাইয়ের মধ্যেও এত আগুন থাকতে পারে!

ইতিমধ্যে রক্ষীরা নিজেদের কাজে শান্তভাবে মনোনিবেশ করলো। অবশ্যই পরিষ্কার জামাকাপড় পরা ভীত শঙ্কিত ভ্রমণার্থী যারা প্যারিস থেকে এসেছিল তাদের সঙ্গে কয়েদীদের ঘুলিয়ে না ফেলে। রক্ষীদের ভেতর একজন লাফ দিয়ে ওয়াগনে উঠে ওর সঙ্গীদের দিকে তাক করে লোহার শেকল, গলার বেড়ি এবং ক্যাম্বিসের পোশাকগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো।

BanglaBook.org

এরপর ওরা নিজেদের ভেতর কাজ ভাগাভাগি করে নিল। কিছু লোক চলে গেল চত্বরটার কোণের দিকে যেখানে তারা লম্বা লম্বা শেকলগুলোকে বিছিয়ে দিল। ওরা অবশ্য শেকল না বলে বলতো দড়ি। অন্যেরা পাথরের ওপর ট্যাফেটা শার্ট, ব্রীচেস ইত্যাদি গুছিয়ে ফেললো। এরপর ওদের ক্যাপ্টেন-এর তত্ত্বাবধানে ওদেরই মধ্য থেকে একজন সবচেয়ে অভিজ্ঞ, খর্বকায়, হৃষ্টপুষ্ট মতো লোক প্রতিটি গলার বেড়ি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো। এই পরীক্ষাটা ও করলো বেড়িগুলোকে পাথরে ঠুঁকে ঠুঁকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলো থেকে আগুনের ফুলকি ঠিকরে বের হয়। এইসব কাজগুলোকে অবশ্য কয়েদীরা বিদ্রূপের মাধ্যমেই স্বাগত জানালো। ওপরতলা থেকে শোনা গেল দণ্ডিত কয়েদীদের কর্কশ হাসির আওয়াজ যাদের মধ্যে কিছু লোকের জন্যেই এতসব আয়োজন। সেইসব চিহ্নিত কয়েদীগুলো পুরনো জেলখানাটার জানলায় জানলায় দাঁড়িয়েছিল। এই জেলখানাটা অপেক্ষাকৃত ছোট চত্বরটার মুখোমুখি।

সমস্ত আয়োজন শেষ হলে মঁসিয়ে ল্যান্সপ্যাক্টর একটা রুপার রাজদণ্ড হাতে করে এসে জেলখানার গভর্নর-কে কিছু একটা আদেশ দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে দুটো তিনটি দরজা যেন ভেদ করে ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়লো। এক পলকেই যেন জেল চত্বরটা ভরে গেল ভীষণ দর্শন, ছেঁড়া খোঁড়া জামা কাপড় পরা এবং ক্রমাগত গর্জন করতে থাকা দণ্ডিত কয়েদীদের ভিড়ে।

জানালা থেকে আগত বীভৎস আনন্দধ্বনির বুক চিড়ে ওরা চত্বরটায় নেমে এলো যেন। ওদের মধ্যেও যারা ভীষণ দাগী আসামী তাদের হাততালি দিয়ে, চিৎকার করে স্বাগত জানানো হলো যে সম্মান ওরাও রাজসুলভ ভঙ্গিতে গ্রহণ করলো। ওদের বেশির ভাগেরই মাথায় টুপি জাতীয় কিছু পরা ছিল। ওগুলো ওরা নিজেরাই নিজেদের কুঠরিতে বসে খড় থেকে তৈরি করেছিল। এবার যে যে শহর দিয়ে ওরা হেঁটে যাবে সেখানকার মানুষজন ওই কিম্ভূতকিমাকার টুপি দেখেই টুপির অধিকারীকে চিনতে পারবে। অতএব সঙ্গত কারণেই এ জাতীয় কয়েদীগুলোর প্রতি প্রশংসা অন্যদের তুলনায় একটু বেশিই করা হচ্ছিল। বিশেষ করে একজন, বছর সতেরোর মেয়েলী মুখের এক যুবক, সে তো সাংঘাতিক রকম অভ্যর্থনা পেল। সেই যুবক একটি কয়েদঘরে এক সপ্তাহের বন্দিবাসে ছিল। খড় দিয়ে সে এমন একটি পোশাক তৈরি করেছিল যাতে তার পা থেকে মাথা অবধি সবটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ওই পোশাক পরে সে চত্বরে এসেছিল হাত পা ছড়িয়ে এঁকে বেঁকে সাপের মতো অনায়াস দক্ষতায়। যাযাবর প্রকৃতির এই যুবক চুরির দায়ে ধরা পড়েছিল। ওদের সবার উদ্দেশ্যে হাততালিতে, চিৎকারে যেন আনন্দ উছলে উঠলো। কয়েদীরাও ওদের অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিতে কসুর করলো না। দাগী আসামী ও হবু দণ্ডিতদের মধ্যে সেই পারস্পরিক উৎসাহ আদান-প্রদান এক ভয়ংকর ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী। কারারক্ষীদের এবং ভীত সন্ত্রস্ত ভ্রমণার্থীদের রূপে যে সমাজের অস্তিত্ব তাকে এই পরিবেশে অবান্তর বলে মনে হয়। অপরাধকে উদ্ধত ভঙ্গিমায় উড়িয়ে দিয়ে এরা যেন শাস্তিটাকেই এক পারিবারিক উৎসবের রূপ দিতে চেয়েছিল।

BanglaBook.org

যাইহোক, এরপর ওদের দু-সারি কারারক্ষীদের ভেতর দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষা করার জন্য একটা লোহার গেটবন্ধ ছোট চত্বরে ঢোকানো হলো। অবশ্যম্ভাবীভাবে ওরা প্রত্যেকেই প্রায় চোখ খারাপ, পা খোঁড়া, হাতে আঘাত লেগেছে এইসব নানান রাহানা দিয়ে নিজেদের অসুস্থতা প্রমাণের চেষ্টা করছিল যাতে চালান হওয়ার হাত থেকে ওরা নিজেদের বাঁচাতে পারে। কিন্তু দণ্ডিতদের জন্য নির্দিষ্ট স্টেশনে যাওয়ার ব্যাপারে ওদের সকলকে অতি অনিবার্যভাবেই সম্পূর্ণ সুস্থ ঘোষণা করা হতো। কয়েদীরাও অবশ্য ঘটনাটাকে খুশিমনেই পাত্তা দিতো না এবং নিজ নিজ জীবনের সব অক্ষমতাকে ভুলে যেতো।

ছোট চত্বরটার লোহার দরজা আরো একবার খুলে গেলে অন্য এক কারারক্ষী নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী ওদের ক্রমিকসংখ্যা ধরে ডাকতো আর ওরা সেই লোহার দরজা দিয়ে এক এক করে বেরিয়ে আসতো আর প্রত্যেকেই প্রধান চত্বরের কোণে গিয়ে জমা হতো তারই পাশে যার নাম ঠিক তার আগেই ডাকা হয়েছে। এভাবে প্রত্যেকটি অপরাধীই যেন নিজের কাছে নিজেকেই হারিয়ে ফেলতো। নিজেদের বাঁধবার শেকল ওরা নিজেরাই বয়ে নিয়ে যেত পাশাপাশি একজন অচেনা লোকের সঙ্গে। এই ভাবেই দণ্ডিতরা এক একজন বন্ধুও পেয়ে যেত যদিও লোহার শেকল তাদের একজনকে অপরের থেকে আলাদা করে রাখতো। মানুষের দুর্দশা কি কখনো এর চেয়ে বেশি হতে পারে?

জনা তিরিশেকের মতো এক জায়গায় জমা হলেই আবার লোহার গেটটা বন্ধ হয়ে যেতো। ডান্ডার ভয় দেখিয়ে একজন কারারক্ষী ওদের লাইন করে দাঁড় করাতো। তারপর প্রত্যেকের সামনে একটা করে জামা, জ্যাকেট আর মোটা কাপড়ের প্যান্ট ছুঁড়ে ফেলতো। নির্দিষ্ট এক আদেশ শুনতে পেলে ওরা সব জামা কাপড় খুলতে শুরু করতো। এই অভাবিত ঘটনা লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় লাঞ্ছনাকে যেন নির্যাতনে পর্যবসিত করতো।

বলা যেতে পারে যে এই অবধি দিনটা মোটামুটি ভালোই কেটেছিল। অক্টোবরের বাতাস যদি কাঁপন ধরিয়ে থাকে তাহলে সেই বাতাস কালো মেঘের মধ্যে ফাঁকও তৈরি করেছিল যাতে সেই ফাঁক দিয়ে সূর্যের কিরণ নেমে আসতে পারে। কিন্তু এরপর হলো কি যে অপরাধীরা ওদের পোশাক খুলেছে কি খোলেনি অথবা সবে কেউ কেউ সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতে পেরেছে; কারারক্ষীরা যখন ওদের শরীর দর্শকদের অনুসন্ধানী চোখের সামনে নেচে কুঁদে জরিপ করে চলেছে, ঠিক তখনই আকাশ কালো হয়ে এলো ও হেমন্তের ঠান্ডা বৃষ্টিধারা হঠাৎই এসে ঝড়ে পড়তে লাগলো প্রচণ্ড বেগে চৌকোণা চত্বরের উপর, দণ্ডিতদের উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ শরীরের উপর আর মাটিতে ফেলে রাখা ওদের পরিধেয় জামা কাপড়গুলোর ওপর।

মুহূর্তের মধ্যে চত্বরটা ফাঁকা হয়ে গেল। রইলো শুধু অপরাধী কয়েদী আর রক্ষীরা। প্যারিস থেকে আসা দর্শকের দল ছুটে গিয়ে দরজার খিলানের নিচে আশ্রয় নিয়েছিল। আরো জোরে বৃষ্টি পড়া শুরু হলো। এইবার পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে চলা

BanglaBook.org

জলধারার মাঝে উলঙ্গ ও কাকভেজা কয়েদীদের ছাড়া আর কাউকে সেই চত্বরে দেখা যাচ্ছিল না। ওদের সমস্ত বীরত্ব, সবরকম আস্ফালন যেন এক বিবর্ণ ঠোঁট চেপে ধরা নীরবতায় রূপান্তরিত হলো। ওরা সবাই প্রচণ্ড ঠান্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছিল আর ওদের দাঁতে দাঁত লেগে আওয়াজ হচ্ছিল। ওদের রোগা রোগা পাগুলো আর হাড় বের করা হাঁটুগুলো পরস্পরের সঙ্গে ঠুঁকে ঠুঁকে যাচ্ছিল। এটা দেখতে যে কোনো মানুষেরই খুব কষ্ট হওয়ার কথা। তবু ওরা কতভাবেই না নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল। যদিও সেগুলো ইতিমধ্যেই প্রচণ্ড ঠান্ডায় নীল হয়ে গিয়েছিল। ওদের জামা প্যান্ট, জ্যাকেটগুলোও ভিজে জবজবে হয়ে সেগুলো থেকে টপটপ করে পানি ঝরছিল। যারা কাপড়চোপড় পরে ছিল তাদের চেয়ে বোধকরি যারা উলঙ্গ দাঁড়িয়ে ছিল তাদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো বোধ হচ্ছিল।

শুধু একজন বৃদ্ধ মানুষই ভীষণ হাসিখুশি ছিল। নিজের ভিজে জামা দিয়ে গা হাত মুছতে মুছতে সে বিরাট হৈচৈ করছিল—'আরে, আরে, আমাদের যে এখানে এরকমভাবে কাকভেজা হয়ে ভিজতে হবে সেকথা তো কেউ বলেনি। তারপর সে হা-হা করে হাসতে হাসতে আকাশের পানে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুঁড়ে দিয়েছিল।

এর পর যখন তাদের চালান যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পোশাক পড়া শেষ হলো, তখন ওদেরকে কুড়ি ত্রিশজনের এক একটি দলে ভাগ করে নিয়ে যাওয়া হলো চত্বরটার উল্টোদিকে যেখানে পেতে রাখা দড়িগুলো (অর্থাৎ লোহার শেকলগুলো) ওদেরই জন্য অপেক্ষায় ছিল। এই দড়িগুলো বেশ লম্বা ও মজবুত লোহার তৈরি। অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট শেকলগুলো কোনাকুনি ডানদিকে দু-ফুট অন্তর ফেলে রাখা। এগুলোর দু-দিকেই একটা করে চৌকো গলবন্ধ আটকানো ছিল। এগুলো খোলে এককোণে লাগানো ছিটকিনির সাহায্যে আর বন্ধ হয় উল্টোদিকের কোণে একটা লোহার নাচি বা কীলক দিয়ে। একজন কয়েদী যতক্ষণ চলতে থাকে ততক্ষণ তার গলায় ওই লোহার গলবন্ধনীটা শেকলসমেত লাগানোই থাকে। যখন (ওদের ভাষায়) দড়িগুলো মাটিতে রাখা হয় তখন কয়েদীদের গলায় মাছের বড়সড় কাঁটা আটকে আছে বলে মনে হয়। বৃষ্টির দরুন পাথুরে রাস্তা কাদায় মাখামাখি হলেও কয়েদীদের ওখানেই বসতে বাধ্য করা হয়। দেখে নেওয়া হয় গলাবন্ধগুলো ঠিক ঠাক মাপমতো আছে কিনা। এরপর দু'জন কামারকে প্রহরাধীনে নিয়ে আসা হয়। ওদের সঙ্গে থাকে নেহাই, হাতুড়ি ইত্যাদি। ওরা ওদের বিশালকায় হাতুড়ির ঘায়ে কয়েদীদের গলবন্ধের নাচিগুলো আটকে দেয়। হাতুড়ির ঘা-টা যখন বেদম জোরে আছড়ে পড়ে সেই ভয়ংকর মুহূর্তটিতে অতিবড় সাহসীরও বুক কেঁপে যেতে বাধ্য। কামার যখন তার পিঠটা পেছন দিকে অনেকটা বেঁকিয়ে নেহাই-এর ওপর হাতুরির ঘা বসায় তখন কয়েদীর থুতনী বিশাল এক ঝাঁকুনি খেয়ে ওপর দিকে উঠে যায়। সামান্য একটু বেঁকে যদি হাতুরির ঘা'টা পড়ে তাহলে গোটা মাথাটাই ছাতু হয়ে যাবে।

এই কাজটা শেষ হয়ে গেলে ওরা সবাই বিমর্ষভাবে চুপ মেরে যায়। লোহার শেকলের ঝনঝনানি, হঠাৎ হঠাৎ কারারক্ষীদের চিৎকার এবং যেসব কয়েদীরা বেগ

BanglaBook.org

দিচ্ছিল তাদের প্রত্যঙ্গে লাঠির ঘা-এর আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। ওদের মধ্যে কেউ কেউ কেঁদে উঠছিল। বৃদ্ধ মানুষটি কেঁপে কেঁপে উঠছিল। বাকীরা অনেকেই নিজেদের ঠোঁট কামড়ে ধরছিল। আর ভীত সন্ত্রস্তভাবে আমি দেখছিলাম লোহার ফ্রেমবন্দী অস্পষ্ট মানুষগুলোর অপরিসীম দুর্দশা।

এইভাবে ডাক্তারদের কাজ শেষ হলে কামারদের কাজ আর কামারদের কাজ শেষ হয়ে কারারক্ষীদের কাজ। কারারক্ষীরা কয়েদীদের ভালো করে পরীক্ষা করার পর ওদের শেকল দিয়ে বাঁধে। তিন অঙ্কের নাটক।

হঠাৎ মনে হয় ওদের মাথায় আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্যই বোধহয় এক ঝলক সূর্যের রশ্মি এসে পড়লো। যেন একটা ঝাঁকুনি লেগে গেল ওদের সবার দেহে। ওরা সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। লোহার শেকলে বাঁধা পাঁচদল কয়েদী কি জানি কী ভেবে হাতে হাত দিয়ে, একটা বিরাট বৃত্ত তৈরি করলো আলোকস্তম্ভটার চারপাশে। তারপর হাতে হাত ধরে ওরা ঘুরতেই থাকলো। ওরা একটা বন্দিদের গানও গাইছিল—এক অশ্লীল চারণ গান। সেটার সুর কখনো বা শোকার্ত আবার কখনো বা অসভ্যভাবে মজাদার। মাঝে মধ্যেই বুক ফাটা কান্নার অথবা দমফাটা হাসির আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল যার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল কিছু রহস্যজনক দুর্বোধ্য কথাও। আর ক্ষণে ক্ষণেই বজ্রনির্ঘোষের মতো হাততালি, লোহার শেকলের ঝনঝনাৎ আওয়াজ এই গণসঙ্গীতের সঙ্গে মানানসই হয়ে বেজেই যাচ্ছিল। আমাকে যদি কখনো ডাইনীদের উৎসবের দিনটি আঁকতে বলা হতো তাহলে এর চেয়ে ভালো করে অথবা এর থেকে খারাপ করে আমি কখনোই তা আঁকতে পারতাম না।

একটা বিশালাকৃতির হাঁড়ি চত্বরটায় বয়ে আনা হয়েছিল যার মধ্যে কিছু সবজি জাতীয় পদার্থ ধোঁয়া ওঠা বদখত দেখতে একটা তরলের মধ্যে ভাসছিল। কারারক্ষীরা লাঠিপেটা করে ওদের নাচ গান থামিয়ে নিয়ে গেল পাত্রটার কাছে। ওটা যদি স্যুপ হয় তাহলে ওটাই ওরা খেল। খাওয়া শেষে ওই স্যুপ আর শক্ত রুটি যা বেঁচে গেল তা ওরা পাথরের ওপর ঢেলে ফেলে দিয়ে আরো একবার নাচ গান শুরু করলো। যেদিন ওদের লোহার শেকলে বেঁধে চালান দেওয়া হতো সেই দিনটাতে এই নাচ গান হৈ-হল্লা করার অনুমতি ওদের ছিল।

এইসব ঘটনাগুলো আমি এত নিবিষ্টচিত্তে দেখছিলাম যে নিজের কথা আমি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। ওদের প্রতি আমার করুণা মর্মমূল কাঁপিয়ে দিয়েছিল বলেই ওদের হাসি গান আমাকে এত কাঁদাচ্ছিল।

যে দিবাস্বপ্নের মায়াজালের মধ্যে আমি পড়েছিলাম তার মধ্যেই আমি দেখলাম যে হঠাৎই যেন নাটক শেষ হয়ে গেল আর সমস্ত কিছু চুপকথা হয়ে গেল। এরপর আমি দেখলাম কয়েদীদের সব ক'টা চোখই আমার জানালার দিকে নিবদ্ধ। 'মৃত্যুর লাইনে' 'মৃত্যুর লাইনে'—আমার দিকে আঙুল তুলে ওরা চিৎকার করে উঠলো। তারপর আমাকে দেখতে দেখতেই যেন ওদের আনন্দের আর সীমা পরিসীমা রইলো না।

আমি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

BanglaBook.org

আমি বুঝতেই পারলাম না কোন সূত্র মারফৎ ওরা আমার ব্যাপারে জানতে পেরেছে। আর তার চেয়েও বড় কথা ওরা আমাকে চিনলোই বা কি করে!

'এই যে, বিদায়!' এটাই ছিল ওদের রসিকতাসুলভ বিদ্রূপ। সীসের মতো ভারী মুখের সবচেয়ে তরুণ এক কয়েদী, যে সারা জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল, আমার দিকে তাকিয়ে হিংস্রভাবে বলে উঠলো—'ভাগ্য করে এসেছে বটে বেজন্মাটা, ব্যাটাকে লটকে দেবে! ঠিক হ্যায় দোস্ত, বিদায়।'

আমার সেই মুহূর্তের অনুভূতির কথা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না কারণ সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো, আরে সত্যিই তো! ওরা তো আমার বন্ধুই ছিল! লা গ্রীভ তো তৌলুরই যমজ। আমি ওদের থেকেও বেশি নিচু হয়ে ওদের অভিবাদন করলাম। উত্তরে ওরাও প্রত্যাভিবাদন করতে আমি কেঁপে উঠলাম।

নিঃসন্দেহে আমি তো ওদের বন্ধুই ছিলাম, আর ক'টা দিন পর আমার নাটক তো ওরাই দেখবে আজ যেমন ওদেরটা আমি দেখলাম।

পাথরের মূর্তির মতো আমি জানালায় দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার সর্বাঙ্গ তখন শক্ত ও চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে গেছে। তবু যখন আমি দেখলাম যে সেই পাঁচদল শৃঙ্খলিত বন্দি চলা শুরু করে আমার দিকে এগোতে এগোতে ওদের পৈশাচিক ভ্রাতৃত্ববোধের কথা জানাচ্ছে; যখন আমি কান ঝালাপালা করা ওদের শেকলের আওয়াজ, ওদের চিৎকার চেঁচামেচি ও পায়ের আওয়াজ পেলাম তখন আমার মনে হলো যে ওই দানবের দল বুঝিবা আমার নোংরা কয়েদঘরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। আমি চিৎকার করে উঠে পাগলের মতো দরজার ওপর সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে চেয়ে। কিন্তু সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। দরজাটা যে বাইরে থেকে বন্ধ করা ছিল। তবু আমি প্রাণপণে ধাক্কা দিলাম বারবার, চিৎকার করলাম। তারপরেও কিন্তু আমি অনুভব করলাম যে রক্ত হিম করা কয়েদীদের সেই হল্লার শব্দ তবুও যেন ক্রমেই আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ব্যাপারটা নিশ্চিত হলাম যখন দেখলাম ওদের মাথাগুলো আমার জানালার গোবরাটের ওপর দেখা যাচ্ছে। আমি আরো একবার ভয়ে চিৎকার করে উঠে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

১৪.

যখন আমার জ্ঞান ফিরলো তখন রাত। দেখলাম নগণ্য হলেও আমি একটা খাটেই শুয়ে আছি। অতি ধীরে দুলে-চলা এক লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পেলাম আমার দু'পাশে সারি সারি শয্যা বিছানো। বুঝলাম আমাকে হসপিটালে নিয়ে আসা হয়েছে।

খানিকক্ষণ আমি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। আমার মন ও স্মৃতিশক্তি সব যেন কেমন ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। শুধু একটাই আনন্দ হচ্ছিল এই ভেবে যে আমি অন্তত একটা খাটে শুয়ে আছি। অবশ্যই একটা সময় ছিল যখন জেল হাসপাতালের এরকম এক শয্যার ভাবনাই আমার বিতৃষ্ণা আনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমি

BanglaBook.org

মানুষটাই তো এখন পাল্টে গেছি। এখানকার চাদরগুলো সব ধূসর রঙের আর ভীষণ রুক্ষ, কর্কশ ও মোটা। কম্বলগুলোও খুব পাতলা এবং ছেঁড়া। তোশকের ওপর থেকেও বিছানার নিচে খড়ের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু কি আসে যায় তাতে যখন আমি টান টান হয়ে শোবার সুযোগ পেয়েছি! আর কম্বল? তা সে যত পাতলাই হোক না কেন তার নিচে শুয়ে যে প্রচণ্ড ঠান্ডা আমার হাড় পর্যন্ত হিম করে দিচ্ছিল সেগুলো তো ধীরে ধীরে গরম হচ্ছে! আমার আবার ঘুম পেয়ে গেল।

অনেক পরে বিশাল একটা চেঁচামেচির আওয়াজে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। তখন সবে দিনের আলো ফুটেছে। চিৎকারটা বাইরে হচ্ছিল। জানলার পাশেই ছিল আমার খাটটা। উঠে বসে তাই দেখার চেষ্টা করলাম যে ব্যাপারটা কী!

জানালা দিয়ে বিসেথ্রে-র সবচেয়ে বড় চত্বরটা দেখা যায়। সেখানে এত লোক জমা হয়েছিল যে অভিজ্ঞ কারারক্ষীদের দুটো লাইনও সংকীর্ণ একটা আড়াআড়ি গলিপথকে জনশূন্য রাখতে বেশ বেগ পাচ্ছিল। সৈনিকদের সেই দুটো লাইনের মাঝখান দিয়ে লোক ভর্তি লম্বা লম্বা পাঁচটা ওয়াগন মাঝে মাঝেই উঁচু হয়ে থাকা পথের পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে গড়াতে গড়াতে যাচ্ছিল। আসলে তখন বেশকিছু কয়েদীকে অন্য কোথাও চালান দেওয়া হচ্ছিল।

সেইসব ওয়াগনগুলোর ছাদ খোলা ছিল। চেনে বাঁধা এক একটা কয়েদীদের দল এক একটা ওয়াগনে বসে ছিল। কয়েদীদের দুটো লাইন ওয়াগনের ভেতরে দু'পাশে ফাঁক ফাঁক হয়ে বসেছিল, একে অপরের দিকে পেছন ফিরে। মাঝখান দিয়ে একটা চেন ওদের দু-ভাগে ভাগ করে রেখেছিল। চেনটার দু-প্রান্তে ছিল দু'জন কারারক্ষী গুলিভর্তি রাইফেল হাতে পাহারায়। ওয়াগনের প্রতিটি ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে ওদের অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা যাচ্ছিল। ঝাঁকানির সঙ্গে ওদের মাথাগুলো লাফিয়ে ওপরে উঠছিল আর ঝোলানো পাগুলো দুলে দুলে উঠছিল।

নিরন্তর ঝরে পড়া ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে বাতাসে একটা কনকনানির ভাব। কাপড়ের প্যান্টগুলো ওদের হাঁটুর সঙ্গে সেঁটে গিয়ে ধূসর রঙের বদলে কালো রঙের বলে মনে হচ্ছিল। কয়েদীদের লম্বা লম্বা দাড়ি আর ছাঁটা চুল ভিজে এক্কেবারে জবজবে। ওদের মুখগুলো ভীষণ বিবর্ণ। ওরা ঠকঠক করে কাঁপছিল আর রাগে ও ঠান্ডায় ওদের দাঁতে দাঁত লেগে আওয়াজ হচ্ছিল। এইটুকু ছাড়া ওদের আর কিছু করার ক্ষমতাও ছিল না। একবার যখন তোমাকে শেকলে বেঁধে ফেলা হবে তখন তুমি বন্দিদল নামে একটা ভয়ানক অস্তিত্বের সামান্য অংশমাত্র ছাড়া আর কিছুই নও। গোটা দলটা যেন একটা মানুষ হিসেবেই সফররত। তোমার যদি মেধা টেধা বলে কিছু থাকে সেটা এখানে বিসর্জন দিতে হবে। কারণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতের আবার মেধা কী? তোমার জৈবিক প্রবৃত্তির ব্যাপারেও বলা যেতে পারে যে সেইসব প্রয়োজনীয়তাও যেমন ক্ষিদে, তেষ্টা ইত্যাদিও একটা নির্দিষ্ট সময় ছাড়া পাওয়া চলবে না। এইরকম নিশ্চুপভাবে, অর্ধ্ব উলঙ্গ অবস্থায়, খালি মাথায়, একই পোশাক পরিহিত অবস্থায় পা ঝুলিয়ে বসেই ওদের দীর্ঘ অভিযাত্রার শুরু। পঁচিশটি দিনের যাত্রা একই ওয়াগনে ঠায় বসে তা সেটা জুলাই মাসের পুড়িয়ে

BanglaBook.org

দেওয়া সূর্যরশ্মির নিচেই হোক অথবা নভেম্বরের বৃষ্টিভেজা দিনের কঠিন ঠান্ডাতে। ভাবতে খারাপ লাগে যে কেমন করে মানুষ আবহাওয়াকেও একটা নির্যাতনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। ওয়াগনের যাত্রী ও উৎসুক জনতার মধ্যে একপ্রকার তীব্র বাদানুবাদও চলছিল। একদিক থেকে যদি ধেয়ে আসছিল অপমান, কটূক্তি তাহলে অন্যদিক থেকে ছুটে যাচ্ছিল দম্ভ। এবং দু-দিক থেকেই অশালীন গালিগালাজ। কিন্তু আমি দেখলাম ক্যাপটেন-এর কী এক ইশারায় ওয়াগনের মধ্যে বসা কয়েদীদের ওপর লাঠি চার্জ শুরু হয়ে গেল। তারপর যাকে বলে কিনা আপাত শান্তি তাই আবার ওয়াগনের মধ্যে বিরাজ করতে লাগলো। শুধু মার খাওয়া মানুষগুলোর চোখ প্রতিশোধের বাসনায় ধ্বক ধ্বক করে জ্বলতেই থাকলো আর ওদের মুষ্টিবদ্ধ অসহায় হাতগুলো কঠিনভাবে নিজেদের হাঁটুর ওপরেই চেপে ধরা রইলো। সব সমেত পাঁচটা ওয়াগন। পদাতিক ও মাউন্টেড সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ওগুলোকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। একে একে ওয়াগনগুলো বিসেত্রে-এর গাড়ি চলাচলের প্রধান রাস্তা পেরিয়ে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। ছ'নম্বর একটা গাড়ি ওই পাঁচটা গাড়িকে অনুসরণ করতে থাকলো যার মধ্যে ছিল বিশাল বিশাল পাত্র, স্যুপ রাঁধার জন্যে প্যান, মগ, হাতা এবং বাড়তি লোহার শেকল যা ঝন ঝন করতে করতে এদিক ওদিক গড়াচ্ছিল। আরো ক'জন পাহারাদার যারা ক্যান্টিনে একটু দেরি করে ফেলেছিল তারাও দৌড়াতে দৌড়াতে পাহারা দেওয়ার কাজে অন্য সবার সঙ্গে যোগ দিতে গেল। অবশেষে জনতা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। গোটা ঘটনাটা যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে এলো। তবুও তখনো বাতাসে ভেসে আসতে থাকলো গাড়ির চাকা, ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ, শেকলের ঝনঝনানি, চাবুকের শাঁৎকার, জনতার গালি গালাজ ফনতাঁব্লঁ-তে যাওয়ার পাথুরে রাস্তার বুক চিরে। কিন্তু এইসবই ছিল ওই কয়েদীদের কাছে দুর্ভাগ্যের সূচনা মাত্র। আমার উকিল আমাকে কী যেন বলেছিল? মৃত্যুদণ্ড! হ্যাঁ বেঁচে থেকে পৃথিবীতে এই নারকীয় যন্ত্রণা ভোগের চেয়ে মৃত্যুও বুঝি বা শ্রেয়! অন্তত গিলোটিনের ধারালো ইস্পাতের ব্লেড এইসব কয়েদীদের গলায় আটকানো লেহার বালার তুলনায় অনেক যত্নেই আমার গলায় আদরের চুমো এঁকে দেবে! হ্যাঁ, হে আমার ঈশ্বর! হয়তো ফাঁসির মঞ্চই ভালো!

১৫.

দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সুস্থই ছিলাম। সুতরাং আমাকে হাসপাতালের আরাম ছেড়ে আবার ফিরে আসতে হলো আমার পুরনো কয়েদঘরে।

আমার কি কোনো অসুস্থতাই ছিল না? না, কারণ আমি ছিলাম স্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী, তরতাজা এক যুবক। আমার শিরা-উপশিরা দিয়ে রক্ত তখনো তেজে বয়ে চলেছে, ইচ্ছেমতো আমি অঙ্গ সঞ্চালনও করতে পারি। সুতরাং ওদের মতে শারীরিক ও মানসিকভাবে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আর অনেকদিন বাঁচার মতো জীবনীশক্তিও আমার

BanglaBook.org

মধ্যে মজুত। এসব কথা সত্যি হলেও একটা নিদারুণ অসুস্থ ভাবনায় আমি রোগগ্রস্ত ছিলাম। তা হলো আমার শেষ অবস্থার ভাবনা যা মানুষের তৈরি ছাড়া আর কিছু নয়।

হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর থেকেই এক অত্যন্ত পীড়াদায়ক ও পাগল করা চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছিল। সেটা হলো যে যদি আমি হাসপাতালে থাকতে পেতাম তাহলে হয়তো আমি মুক্তি পেলেও পেতে পারতাম। ডাক্তার ও নার্সদের আমাকে ঘিরে বেশ উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল। হয়তো এত কম বয়সে আমাকে এইরকম একটা মৃত্যুবরণ করতে হবে বলেই বুঝিবা! ওরা দলে দলে এসে আমার বিছানার চারপাশে ঘিরে দাঁড়াতো এবং দেখে মনে হতো যে ওরা সত্যিই আমার জন্য দুঃখিত। কিন্তু না। আসলে ওটা ছিল ওদের একটা অলস অনুসন্ধিৎসা মাত্র! যাই হোক, ওদের ওই জাতীয় সান্ত্বনা তোমার জ্বর ভালো করতে পারলেও মৃত্যু দণ্ডাদেশ তো রদ করতে পারে না। অথচ ওদের কাছে কাজটা কতই না সহজ! ওরা তো সহজেই একটা দরজা খোলা রাখতে পারতো! আর তাতে ওদের কিইই বা এসে যেতো!

কিন্তু আমার সে সুযোগ তো চিরকালের মতো হাতছাড়া হয়ে গেছে। আমার আবেদন এবার নাকচ হয়ে যাবে জানি কারণ আমার বিচারের সময় ওরা কোনো ফাঁক ফোকড়ই রাখে নি। সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিয়েছে, বাদী-বিবাদী পক্ষের উকিলেরা সওয়াল জবাব করেছে, জজেরা তাদের রায়ও দিয়েছে। সুতরাং আর কোনো আশা নেই যদি না... নাহ্ সেটা ভাবাও তো পাগলামী! আর কোনো আশাই নেই। আবেদন করাটার অর্থ এখন সেটাকে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা একটা কিছু সশব্দে নেমে আসার ঠিক ওপরে—আর ক্রমাগত দড়িটার ক্ষয়ে যাওয়ার শব্দ শোনা প্রতি মুহূর্তে যতক্ষণ না দড়িটা ছিঁড়ে পড়ে।

মোদ্দা কথা গিলোটিনের ব্লেড একটা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর গলায় নেমে আসতে সময় লাগে সব মিলিয়ে ছ'সপ্তাহ।

কিন্তু ধরুন যদি আমাকে ক্ষমাই করে দেওয়া হয় তাহলে? ক্ষমা? কে করবে আমাকে ক্ষমা? কোন যুক্তিতে? কেমন ভাবে? নাহ্, ক্ষমা টমা করার কোনো রাস্তাই আর নেই। বরং ওরা বলবে আসুন আমরা লোকটাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করি। ওরা যেমনটা সচরাচর বলে আর কি!

আমাকে আর মাত্র তিনটি ধাপ পেরোতে হবে—বিসেথ্রে দ্য কনসিয়ার্জেরি এবং লা গ্রীভ।

১৬.

যে অল্প কয়েক ঘণ্টা আমি জেলের হাসপাতালে কাটিয়েছিলাম তার মধ্যে বেশির ভাগ সময়টাই আমি জানালার ধারে বসেছিলাম। উপভোগ করেছিলাম ফুটে ওঠা সূর্যের আলো। অথবা ঠিক ততটাই সূর্যের আলো যতটা লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে আমার গায়ে এসে পড়েছিল।

BanglaBook.org

ওখানে আমি বসেছিলাম হাতের তালুর মধ্যে মাথা গুঁজে, হাঁটুর ওপর কনুই রেখে। চেয়ারের আড়াআড়ি কাঠে পা রাখা ছিল। দুরন্ত এক হতাশা আমাকে কুঁজো করে এমনভাবে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে দিয়েছিল যে মনে হচ্ছিল আমার দেহের কোনো হাড় বা মাংসে একটা পেশীও অবশিষ্ট নেই।

আমাকে সবচেয়ে বেশি ক্লিষ্ট করে তুলেছিল জেলের বোটকা দুর্গন্ধ। আমার কান মাথা তখনো ভোঁ ভোঁ করছিল কয়েদীদের লোহার শেকলের ঝনঝনানিতে, ওদের চিৎকারের রেশে। বিসেথ্রে আমাকে ক্রমাগত ক্লান্ত ও অসুস্থ করে তুলছিল। মনে হচ্ছিল আমার প্রতি ঈশ্বরের করুণা করা উচিত এবং সেই করুণাবশেই উল্টোদিকের ছাদের কার্ণিশে আমার জন্য অন্তত একটা ছোট্ট পাখিকে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত যে আমায় গান শোনাবে।

আমি জানি না ঈশ্বর না শয়তান কে আমার প্রার্থনা শুনেছিল। তাই পরমুহূর্তেই আমি শুনতে পেয়েছিলাম ঠিক আমার জানালার নিচেই এক সুরেলা কণ্ঠস্বর। কিন্তু সেটা কোনো পাখির নয়। তার চেয়েও অনেক বেশি মিষ্টি। বছর পনেরো ষোলোর এক মিষ্টি মেয়ের খাঁটি, নরম ও নির্মল কণ্ঠস্বর। হতচকিত হয়ে মহানন্দে আমি মেয়েটির গান শুনলাম। ধীর লয়ে মিঠে, সুরেলা সেই গান মেয়েটি বিষাদমাখা কাঁপা গলায় গেয়ে চলেছিল। যে গানের কথাগুলো ছিল এ রকম

BanglaBook.org

যখন আমি গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম
টু-রা-লাই; টু-রা-লাই;
ওরা আমাকে পাকড়ালো
এবং তা বন্ধুভাবে মোটেও না
টু-রা-লে, টু-রা-লে,
নোংরা পুলিশগুলো আমাকে পেড়ে ফেললো
টু-রা-লু-রা-লু-রা-লাই
ওরা আমাকে বন্দি করে রেখে
চাবি হারিয়ে ফেললো
টু-রা-লাই, টু-রা-লাই, টু-রা-লে,

সেই মুহূর্তে কোনো কথাই আমার অপরিসীম হতাশাকে ভাষায় বর্ণনা করতে পারতো না। সেই কণ্ঠস্বর গেয়েই চলেছিল

ওরা আমার হাতে হাতকড়া পরিয়েছিল
টু-রা-লাই, টু-রা-লাই;
আমার কোনো আশাই ছিল না

কারণ আমাকে হিসি করানো হচ্ছিল
টু-রা-লে, টু-রা-লে;
সার্জেন্ট হেসে মরে যাচ্ছিল,
টু-রা-লু-রা-লু-রা-লাই;
কীভাবে ধূলোর ওপর দিয়ে আমার পাছাটা
ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা দেখে
টু-রা-লু-রা-লু-রা-লে;
সেই সময় আমার মধ্যের খারাপ লোকটাকে দেখা গেল
টু-রা-লাই, টু-রা-লাই, টু-রা-লে।

আমি চেঁচিয়ে বললাম
'বন্ধু এতে হাসির কিছু নেই,'
টু-রা-লাই, টু-রা-লাই;
বরং আমাকে নাগর বলে ডাকো
টু-রা-লে, টু-রা-লে;
কারণ আমাকে নিয়ে তো জব্বর মজা লুটেছো,
টু-রা-লু-রা-লু-রা-লাই;
মেয়েটা আমার পাগলী ছিল,
টু-রা-লু-রা-লু-রা-লে;
তাই সে অনেক দুঃখে বলেছিল,
'হা ঈশ্বর, এ তুমি কি করলে?'
টু-রা-লাই, টু-রা-লাই-টু-রা-লে।

BanglaBook.org

'এস বাজে কথা ছেড়ে সত্যি কথা শুনি'
টু-রা-লাই, টু-রা-লাই;
আমি একটা লোককে মেরেছি, শাস্তিও পেয়েছি
টু-রা-লে, টু-রা-লে;
বৌয়ের অজান্তে আমি ওর টাকা হাতাতে চেয়েছিলাম,
টু-রা-লু-রা-লু-রা-লাই;
ভালোবাসার খাতিরে হয়তো কাজটা ঠিকই ছিল
টু-রা-লু-রা-লু-রা-লে;
আর একটা আংটির দাম
দু-এক শিলিং-এর বেশি তো নয়,
টু-রা-লাই, টু-রা-লাই, টু-রা-লে।

বয়স্কা নারীটির উদাস চোখ ছিল পলকহীন,
টু-রা-লাই, টু-রা-লাই।
তাকে ভার্সেলেইসে পৌঁছে দেবার জন্য
কত লোকের কাছেই তো সে দয়া চেয়েছিল,
টু-রা-লে, টু-রা-লে;
সে রাজার কাছে গিয়ে দরবার করেছিল
টু-রা-লু-রা-লু-রা-লাই;
নচ্ছারটা যা চায় তাই দিতে রাজি ছিল
টু-রা-লু-রা-লু-রা-লে;
আমাকে এই নরক থেকে বের করতে
টু-রা-লাই, টু-রা-লাই, টু-রা-লে।
দিব্যি করছি, যদি আমার ছুট্‌করা মেলে,
টু-রা-লাই, টু-রা-লাই;
তবে ওকে একটা জব্বর করে চুমু খাব
টু-রা-লে, টু-রা-লে;
ওকে অনেক পোশাকও কিনে দেবো
টু-রা-লু-রা-লু-রা-লাই;
বাড়ির সব গয়নাই সেই রাতে হবে তার,
টু-রা-লু-রা-লু-রা-লে;
মুক্তো লাগানো জুতো
তার পাদুটোকে সাজিয়ে তুলবে,
টু-রা-লাই, টু-রা-লাই, টু-রা-লে,

কিন্তু ও নাকি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল
টু-রা-লাই, টু-রা-লাই;
ফলে গভর্নরের পলতেতে আগুন ধরে গিয়েছিল
টু-রা-লে, টু-রা-লে;

তিনি বলেছিলেন—'জিভটাকে একটু বিশ্রাম দাও,'
টু-রা-লু-রা-লু-রা-লাই;
তোমার বুড়োর ভবিষ্যৎ অন্ধকার
টু-রা-লু-রা-লু-রা-লে
আমি তাকে এমন সুন্দর শাস্তি দিচ্ছি
যাতে সে বাতাসে হেঁটে বেড়াতে পারে।
টু-রা-লাই, টু-রা-লাই, টু-রা-লে।

BanglaBook.org

আমি আর শুনিনি। শুনতে পারতামও না। অর্ধেক বলা, অর্ধেক না বলা সেই ঘৃণা জড়ানো বিলাপের অর্থ, অপরাধীর সঙ্গে রক্ষীদের দ্বন্দ্ব, চোরের মুখোমুখি হওয়া ও তার বৌয়ের উদ্দেশ্যে পাঠানো এই ভয়ানক খবরটা আমি একটা খুন করেছি এবং আমাকে ধরা দিতে হয়েছে। আবেদন ও আর্জি নিয়ে নারীটি ভার্সেইলেস-এর দিকে ছুটছে। আর সেই গভর্নর যে মেজাজ হারিয়ে মেয়েটির স্বামীকে সাংঘাতিক শাস্তি দেবার ভয় দেখাচ্ছে, এই সমস্তটাই এমন মোহিত করা সুরে ও মিষ্টি গলায় গাওয়া যে, কোনো দেহই এই গান শুনে শান্তিতে ঘুমাতে পারেনি। উল্টো আমি আরো নির্জীব ও ভয়ে ঠান্ডা মেরে গেলাম। নিষ্কলঙ্ক, গোলাপের মতো রাঙা টুকটুকে ঠোঁট থেকে ওই নোংরা কথাগুলো যে কীভাবে বেরিয়ে এলো এটা ভাবাও যেন এক দুঃস্বপ্ন। মনে হলো সদ্যস্ফুট এক গোলাপের পাপড়িতে কোনো এক উদ্ভিদ নষ্টকারী কীট তার সব ক্লেদ ঢেলে দিয়ে গেছে।

আমার এতো খারাপ লেগেছিল যে আমি তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না বেদনা—তবু তার মধ্যেও কত যেন ভালোবাসার আঘাত লুকিয়ে ছিল। চোর ডাকাতের কথ্যভাষা শুধু যে ঘৃণিত ও অশ্রাব্য ছিল তাই নয় ওটা উদ্ভটও ছিল। সুললিত গলার সেই গান যেন এক তরুণী ও এক নারীর মাঝখানের কেন্দ্রবিন্দুতে ভর করে হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে এসেছিল। আর এই বিদঘুটে ও বিকলাঙ্গ গানটি গাওয়ার জন্য ভাষার ক্ষেত্রে কি কারিকুরিটাই না তাকে করতে হয়েছে!

ওফ্, কি ঘৃণিত জায়গা এই জেলখানা! এর বিষ সবকিছু বিষাক্ত করে দেয়, নষ্ট করে দেয়। নিস্তেজ হওয়ার হাত থেকে কোনোকিছুই রক্ষা পায় না। একটা পনের বছরের মেয়ের গানও না। তুমি যদি জেলে একটা পাখি দেখতে পাও তাহলে নিশ্চিত জানবে যে ওর ডানায় ঘৃণিত কাদা লেগে আছে অথবা সুগন্ধের আশায় যদি কোনো সুন্দর ফুল তুমি তোলো তাহলে অনুভব করবে যে সেটা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

১৭.

ওফ্! যদি আমি মুক্তি পেয়ে যেতাম, তাহলে মাঠে মাঠে কি দৌড়টাই না দৌড়াতাম! যদিও দৌড়ানোটা পাগলামি। কারণ সেটা করলেই সবার নজর তোমার দিকে পড়বে আর তুমি সন্দেহমুক্তও থাকবে না। তার চেয়ে বরং ধীরে ধীরে, মাথা উঁচু করে হেঁটে যাও আর গান গাও। চেষ্টা করো যাতে পুরনো নীল রঙের একটা অন্তর্বাস জোগাড় করতে পারো যাতে লালের এমব্রয়ডারী কাজ করা থাকবে। ওটা একটা দারুণ ছদ্মবেশ। সব মালীরাই এখানে ওরকমটাই পোশাক পরে।

আরকুইল-এর কাছে, আমি জানি একটা জলাভূমি আছে। আছে গাছপালার জটলাও। আমি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আমার স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে সেখানে ব্যাঙ ধরতে যেতাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে লুকোচুরি খেলতাম।

BanglaBook.org

তারপর রাত নেমে এলে, আমার যাত্রা শুরু হতো। চলে যেতাম ভিন্সেনেস-এর দিকে। কিন্তু নাহ্, নদী পার হতে পারতাম না। তাই হাঁটা লাগাতাম আরপাঁজ-এর দিকে। কিন্তু আজ বুঝি যে সঁ জার্মেন-এর দিক লক্ষ্য করেই আমার এগোনো উচিত ছিল। তারপর লে হ্যাভর পৌঁছে সেখান থেকে একটা নৌকায় চেপে সোজা ইংল্যান্ড। যাইহোক, বড়জোর আমি লঁজুনুঁ পর্যন্ত যেতে না যেতেই কোনো এক টহলদার পুলিশের নজরে পড়ে যেতাম। অমনি সে আমার পাসপোর্টটি দেখতে চাইতো... ব্যস্, আমার খেল খতম!

ওহে স্বপ্নবিলাসী, জেলের যে তিনফুট চওড়া পাথরের দেওয়াল তোমাকে বন্দি করে রেখেছে তুমি বরং ওটা ভাঙা দিয়েই শুরু করো এবার। ওফ্, মৃত্যু! কি ভয়ানক মৃত্যু!

এইরকম একটা মুক্তির খোঁজে আমি ছেলেবেলায় বিসেত্রে-তেও চলে আসতাম যাতে আমি দেখতে পাই ওঁর বিশাল পাথুরে দেওয়াল আর সেই দেওয়ালের অভ্যন্তরে পাগল মানুষগুলোকে!

১৮.

এগুলো যখন আমি লিখছিলাম তখন আমার বাতির আলোটা কমিয়ে দিয়ে ভোর এসে হাজির। চার্চের ঘড়িতে তখন ঠিক ছ'টা।

কিন্তু এসবের মানে কী? যে রক্ষী পাহারায় ছিল সে এইমাত্র আমার কুঠুরিতে এসে শ্রদ্ধার সঙ্গে তার মাথার টুপি খুলে আমাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তার কর্কশ গলার স্বর যতটা কোমল করা সম্ভব ততটাই করে আমাকে শুধিয়েছিল যে জলখাবারে আমি কী খেতে চাই...

হঠাৎই আমার দেহে একটা শিহরণ খেলে গেল। তাহলে কি আজই সেই দিন?

১৯.

হ্যাঁ, আজই সেই দিন!

জেল গভর্নর নিজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন। এমনও জিজ্ঞেস করেছেন যে কোনোভাবে উনি আমার কোনো সাহায্যে আসতে পারেন কি না। উনি আরো বলেছিলেন—'আশা করি আমার বা আমার অন্য কোনো কর্মচারীর ওপর আপনার কোনো অনুযোগ বা বিদ্বেষ নেই।' এছাড়াও উনি খুব সম্ভ্রম দেখিয়ে আমার শরীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছিলেন, শুধিয়েছিলেন রাতে আমার ঠিকঠাক ঘুম হয়েছিল কি না, আর ফিরে যাওয়ার সময় উনি আমাকে 'মহাশয়' বলেও সম্বোধন করেছিলেন!

তাহলে? সত্যিই কি আজ সেই দিন?

BanglaBook.org

২০.

এই কারাধ্যক্ষ বিশ্বাসই করতে পারেন না যে আমার ওঁর বা ওঁর কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে নালিশ করার কোনো অজুহাত থাকতে পারে। এবং উনিই সঠিক। নালিশ করাটা আমার পক্ষে অসভ্যতা হতো; ওরা সবাই তো ওদের কর্তব্যই করেছে মাত্র। ওরা আমাকে ভালোভাবে পাহারা দিয়েছে। যখন প্রথম এসেছিলাম তখন এবং এই এখন যাওয়ার সময় ভদ্র ব্যবহারও করেছে। সুতরাং ওদের ব্যবহার সম্পর্কে আমার অতৃপ্তির কোনো কারণ থাকা উচিত কি?

এই সৎ কারাপ্রধান, এবং ওঁর প্রশ্রয়দায়ক মুচকি হাসি, নম্র কথাবার্তা, অনুগত অথচ অনুসন্ধানী চোখ, পেশীবহুল হাতের সঞ্চালন, সবই যেন এই জেলের তৈরি। উনি সম্পূর্ণভাবেই বিসেথ্রে-এর তৈরি এক মানবসম্পদ। যা কিছু আমার চারপাশে তার সবটাই তো জেলখানা। আমি এই জেলখানা দেখি বিভিন্ন আকারে, আকৃতিতে। ঠিক ততখানিই মানুষের ছদ্মবেশে যতখানি কিনা লোহার গরাদে, ছিটকিনিতে, তালায়, শেকলে। এই দেওয়ালটা হচ্ছে একটা পাথরের জেল; এই দরজাটা হচ্ছে কাঠের জেল; এইসব কারারক্ষীরা হচ্ছে রক্ত মাংসের জেল। জেলখানা হলো মানুষেরই সৃষ্ট এক ঘৃণ্য জীব। এক এবং অভিন্ন—যার অর্ধেকটা হলো পাথরের অন্য অংশটা রক্তমাংসের। আমি আজ এরই এক শিকার। এই জীবটি আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করে; গ্র্যানাইটের দেওয়ালের অন্তরালে বন্দি করে রাখে তালা চাবি দিয়ে; এবং কারারক্ষীদের চোখ দিয়ে এ আমাকে সব সময় পাহারা দেয়।

আমি যে একটা হতভাগ্য শয়তান! তাই আমার দ্বারা আর কি-ই বা হতে পারে? আর ওরাই বা আমার জন্যে কী করবে?

BanglaBook.org

২১.

আমি এখন শান্ত। সব শেষ হয়ে গেছে, সম্পূর্ণভাবে শেষ। গভর্নর-এর আমাকে দেখতে আসা আমাকে যে ভয়ের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল তার থেকে আমি এখন মুক্ত। কারণ সত্যি কথা বলতে কি গভর্নর-এর আসার আগে অবধি আমি সম্পূর্ণভাবে আশাহত ছিলাম না। কিন্তু এখন? ঈশ্বরও জানেন যে আর কোনোই আশা নেই।

ঘটনাটা এইরকম ঘটেছিল।

ঠিক সাড়ে ছ'টার সময়—না-না ভুল বললাম—পৌনে সাতটার সময় আমার জেল কুঠুরির দরজাটা খুলে গেল। বাদামী রঙের ঢিলেঢালা কোট পরা ধবধবে সাদা চুলের একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভেতরে এলেন। তিনি তাঁর কোটটা খুলতে থাকলে দেখলাম ভেতরে যাজকদের উপযুক্ত পোশাক। ও, তাহলে উনি একজন যাজক!

এই যাজকটি কিন্তু জেলখানার যাজক নন। সুতরাং গোটা ব্যাপারটা ভালো মনে হলো না। প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গিতে মুচকি হেসে তিনি আমার উল্টোদিকে বসলেন।

তারপর মাথা নেড়ে তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। অথবা জেলখানার সিলিংয়ের দিকে। তাঁর ইঙ্গিতের অর্থ আমি বুঝলাম।

উনি শুধালেন—'কি বাবা, তৈরি তো?'

ক্ষীণভাবে উত্তর দিলাম—'তৈরি নই যদিও তবু আমি তৈরি।' কিন্তু যে মুহূর্তে এই কথাগুলো উচ্চারণ করলাম, তখন সমস্ত পরের ঘটনা যা ঘটতে চলেছে সেগুলো যেন আমার চোখের সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো। ঠান্ডা ঘামে আমার সর্বাঙ্গ ভিজে গেল। কপাল দপ দপ করতে লাগলো আর কান দুটো যেন ভোঁ ভোঁ শব্দে বুঁজে এলো।

যখন আমি চেয়ারে গা এলিয়েছিলাম ঘুমন্ত মানুষের মতো তখন সেই দয়ালু লোকটি অনেক কথাই বলেছিলেন। অথবা সেরকমটাই আমার মনে হয়েছিল। কারণ আমি ওঁর ঠোঁট নড়তে, হাত ওঠানামা করতে ও চোখ মাঝে মধ্যেই জ্বলে উঠতে দেখেছিলাম।

আমার বন্দিবাসের দরজাটা আরো একবার খুলে গেল। ছিটকিনি খোলার তীক্ষ্ণ আওয়াজে আমি আমার প্রায় অচৈতন্য অবস্থা থেকে জেগে উঠলাম। ওদিকে বৃদ্ধ যাজকও চুপ করে গেলেন। কালো পোশাক পরা এক ভদ্রলোক জেলের গভর্নর-কে সঙ্গে নিয়ে এসে আমাকে অনেকটা ঝুঁকে অভিবাদন করে নিজের পরিচয় দিলেন। সমাধিস্থ করার কাজে নিয়োজিত মানুষজনের বৃত্তিসুলভ গম্ভীর ভাবভঙ্গি ভদ্রলোকের চালচলনে প্রকট। ওঁর হাতে গোল করে পাকানো একটা কাগজ ছিল।

অনুকম্পা মিশ্রিত একটুকরো হাসি ছুঁড়ে তিনি বললেন—'মহাশয়, আপনার উদ্দেশ্যে রয়েল কোর্ট অব প্যারিস-এর উইজেঁ-এ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয়ের লেখা একটি সংবাদ আমার বয়ে আনার সৌভাগ্য হয়েছে।'

প্রথম ধাক্কার অভিঘাতটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতেই আমার বিবেক বুদ্ধি আবার ফিরে এলো।

আমি বললাম—'অর্থাৎ সেই এ্যাটর্নী জেনারেল যিনি আমার মাথা নেওয়ার জন্য খুবই উদগ্রীব? আর তা যদি হয় তাহলে তো বলতে হবে সৌভাগ্যটা আমারই। অন্তত ওঁর মতো লোক যদি আমার মতো এক নগণ্যের উদ্দেশ্যে কিছু লেখার কষ্ট আদৌ করে থাকেন। আশা করি আমার মৃত্যুতে উনি অত্যন্ত খুশি হবেন। তবে আমার ভাবতেও খারাপ লাগছে যে, যে মাথাটা ধড় থেকে নামাবার জন্য তিনি এত উদগ্র সেটা তাঁর কাছে এত অকিঞ্চিৎকর!'

এতগুলো কথা বলার পর আমি আবারও শান্তভাবে বললাম—'মহাশয়, দয়া করে সংবাদটা কি পড়ে শোনাবেন?'

ভদ্রলোকটি তখন লম্বা দস্তাবেজটা খুলে, প্রায় প্রত্যেকটা শব্দের ওপর হোঁচট খেতে খেতে সেটা পড়তে শুরু করলেন। ওঁর গলার স্বর প্রতিটি লাইনের শেষে বেশ উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হচ্ছিল।

আমার আবেদন নাকচ হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

'অতএব প্লেস দ্য গ্রীভ-এ শাস্তি দেওয়ার ঝামেলাটা আজই মিটিয়ে ফেলা হবে।' সীলমোহর লাগানো কাগজটার ওপর থেকে চোখ না তুলেই উনি পড়া শেষ করলেন।

'গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে আমাদের ঠিক সাড়ে সাতটায় রওয়ানা দিতে হবে। অতএব মহাশয়, আপনি কি আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য ঠিক ওই সময় তৈরি হয়ে থাকবেন?'

শেষ ক'টা মুহূর্ত আমি ওঁর কথা শুনছিলামই না। গভর্নর সাহেব যাজকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আর এই ভদ্রলোকটি তাঁর কাগজের ওপর থেকে তখনো চোখ তোলেন নি। আমি দরজার দিকে তাকালাম। দরজাটা খোলাই ছিল... ওফ্ কি সব যা তা পাগলের মতো ভাবনা! করিডরেই তো চারজন রাইফেলধারী রক্ষী পাহারায়!

এবার সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে উইজেঁ আবার প্রশ্নটা করলেন। 'আপনি যখন বলবেন'—আমি উত্তর দিলাম—'আপনার যখন খুশি।' ভদ্রলোকটি নিচু হয়ে আমাকে অভিবাদন করে বললেন—'তাহলে আর আধঘণ্টার মধ্যেই আপনাকে ডাকার সৌভাগ্য আমার হবে।'

তারপর আমাকে একা রেখে ওরা সবাই চলে গেল।

হে ঈশ্বর, আমাকে পালাতেই হবে! যেভাবেই হোক না কেন! আমাকে পালাতেই হবে, যেমন করে হোক! এক্ষুণি! তা সে দরজা দিয়ে, জানালা দিয়ে অথবা ছাদের মধ্যে দিয়ে। তাতে যদি আমার দেহের মাংসপেশীগুলো কড়ি বরগায় ঝুলতে থাকে তাও!

কিন্তু কি ভয়ানক বিধিলিপি আমার। এই পাথরের দেওয়াল ভেদ করে বের হতে ভালো যন্ত্রপাতি নিয়েও মাসের পর মাস লেগে যাবে। অথচ আমার কাছে একটা পেরেক পর্যন্ত নেই অথবা আর যে একটি ঘণ্টাও বাকি নেই সেই সময় আসতে!

BanglaBook.org

২২.

দ্বারপালদের কাছ থেকে

যাই হোক আমাকে 'বদলি' করা হলো, সরকারি কাজের নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী, যেমনটা বলে আর কি। তবে যাত্রার সমস্ত কিছুই বর্ণনাযোগ্য।

ঘড়িতে সাড়ে সাতটা যেই বাজলো তক্ষুণি সেই লোকটি আমার ঘরের দরজায় এসে হাজির। 'স্যার,' সে বললো, 'আমি আপনার জন্যে তৈরি।' হায়! এইবার সে আর একা নয়।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে এক পা এগিয়ে গেলাম এবং ভাবলাম যে এখন থেকে কোনো মুহূর্তের ওপরই আমার আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। মাথাটা ভীষণ ভারী লাগছিল। মনে হচ্ছিল পায়ে যেন কোনো জোরই আর অবশিষ্ট নেই। তবু

কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে আমি মোটামুটি সহজভাবেই হাঁটতে লাগলাম। নিজের কয়েদঘর থেকে বের হওয়ার আগে শেষবারের মতো আমি ওটার মধ্যে চোখ বুলালাম। সত্যি বলতে কি ঘরটার ওপর আমার বোধহয় একটু ভালোবাসাই জন্মে গিয়েছিল। তারপর আমি ঘরটাকে শূন্য ও খোলা রেখে এগিয়ে চললাম। একটা কয়েদঘরকে খোলা দেখা ও কয়েদীবিহীন দেখা অবাক করার মতো ঘটনা নয় কি?

যাইহোক বেশিদিন তো আর কয়েদঘরটা ওইরকম পড়ে থাকবে না! আজ সন্ধ্যাতেই ওখানে কার জানি ঢুকে দখল নেওয়ার কথা। জেলের চাবি যার কাছে থাকে তার মুখ থেকেই শোনা। হয়তো এই মুহূর্তেই ফৌজদারী কোর্ট অপরাধীটির বিপক্ষে দণ্ডাদেশ দিচ্ছে!

যেখানে করিডরটা বিভক্ত হয়ে গেছে যাজক সাহেবের সঙ্গে সেখানেই আমাদের দেখা। জলখাবার সেরে এসেছেন সবে।

যখন আমি জেলখানা ছেড়ে যাচ্ছিলাম তখন জেল গভর্নর আন্তরিকভাবেই আমার করমর্দন করলেন বটে কিন্তু আরো চারজন পুলিশকে আমাকে প্রহরা দেওয়ার কাজে যোগ করতে ভুললেন না।

একজন মুমূর্ষু বৃদ্ধ যাকে হাসপাতালের দোরগোড়ায় ফেলে রাখা হয়েছিল সে আমাকে দেখে বলে উঠলো—শিগগির তাহলে আমাদের আবার দেখা হচ্ছে!

আমরা চত্বরটায় এসে পৌঁছালাম আর বুক ভরে প্রশ্বাস নিয়ে যেন আবার নতুন করে বেঁচে উঠলাম। কিন্তু খোলা হাওয়ায় আমরা বেশিক্ষণ হাঁটি নি। একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি চত্বরটার বাইরে অপেক্ষা করছিল। এটা সেই গাড়িটা যেটা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল। একটা এক ঘোড়ায় টানা আয়তক্ষেত্রের মতো বগি যেটার চওড়া ভাগটা শক্তপোক্ত লোহা দিয়ে তৈরি জালের মতো গ্রিল দিয়ে দুভাগে ভাগ করা। দুটো অংশেরই একটা করে দরজা ছিল। একটা সামনে আর একটা গাড়িটার পেছন দিকে। আর গোটা গাড়িটা এত নোংরা, কালো ও ধূলিধূসর যে একটা ভিখারির লাশ বয়ে নিয়ে যাওয়ার গাড়িও এর তুলনায় মনে হবে রাজ্যাভিষেকের শকট।

সেই দু-চাকাওয়ালা সমাধিক্ষেত্রে নিজেকে সমর্পণ করার আগে আমি চত্বরের চারপাশে তাকালাম এমন করুণভাবে যে সেই দৃষ্টি দেখে জেলখানার দেওয়ালগুলোও বুঝিবা ভেঙে পড়তে পারতো। গাছপালা ঘেরা ছোট বর্গাকৃতি এই চত্বরটা কয়েদীদের চালান দেবার দিনের চেয়েও অনেক বেশি উৎসুক জনতার ভিড়ে ভর্তি। এর মধ্যেই এত ভিড়!

কয়েদীদের চালান দেওয়ার দিন থেকেই যে ঝিরঝিরে বরফ বৃষ্টি শুরু হয়েছিল তা তখনো সমানেই চলছিল। এমনকি এসব লেখার সময়েও এবং মনে হয় আমি যখন থাকবো না তখনো এই বরফবৃষ্টি এরকমভাবেই অবিশ্রান্তভাবে ঝরতেই থাকবে।

BanglaBook.org

রাস্তাগুলো খানাখন্দে বোঝাই। গোটা চত্বরটা জল-কাদায় হাবুডুবু খাচ্ছিল। হাঁটু অবধি জল-কাদায় ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে দেখে আমার আনন্দই হচ্ছিল।

আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। সেই উইজেঁও একজন রক্ষী সামনের কম্পার্টমেন্টে। আর আমি, যাজক সাহেব ও অন্য একজন পাহারাদার অন্য কম্পার্টমেন্টটায়। চারজন অশ্বারোহী পুলিশ গাড়িটাকে ঘিরে ছিল। তাহলে হিসেব দাঁড়াচ্ছে কোচম্যানকে বাদ দিলে একের বিপক্ষে আটজন।

আমি যখন গাড়িতে উঠলাম তখন কটা চোখের এক বৃদ্ধা বলে উঠলো—'আরে, কয়েদীদের শেকলে বেঁধে চালানের চেয়ে তো এই ব্যাপারটা অনেক ভালো।'

আমিও সেটা বুঝি। আসলে এই দৃশ্যটা খুব সহজেই এক ঝলকে দেখে নেওয়া যায়। অথচ এটাও সমানভাবে হৃদয়গ্রাহী, আকর্ষণীয় এবং অনেক বেশি সুবিধাজনক। অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়ার ভয় নেই বললেই চলে। মাত্র একজন লোক, কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যেন সমস্ত কয়েদীদের দুর্ভাগ্য একত্রিত করলে যা হয় তাই। এর বিস্তৃতি অনেকটাই কম অথচ ব্যাপারটা বেশ জমাট। যেন অনেকটা সুগন্ধী মদের মতো।

গাড়িটাতে একটা ঝাঁকুনি লাগলো। আর তারপর চাকায় ভোঁতা আওয়াজ করতে করতে সেটা প্রধান গেট ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়লো। বিসেত্রে-এর দু-দুটো ভারি দরজাই গাড়িটার পেছনে বন্ধ হয়ে গেল। আমাকে একটা হতচকিত অবস্থার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আমার অবস্থা তখন এক অদ্ভুত আচ্ছন্ন মানুষের মতো—যে নড়তে চড়তে পারে না তো বটেই, কাঁদতেও পারে না যদিও সে জানে যে তাকে সমাধিস্থ করার জন্যই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম ঘোড়ার গলায় বাঁধা ঘণ্টিগুলোর একটা নির্দিষ্ট ছন্দে বেজে বেজে ওঠা, লোহার নাল লাগানো চাকার সঙ্গে পাথুরে রাস্তার সংঘর্ষের আওয়াজ, অথবা গোটা গাড়িটার কাঠগুলোর মর্মান্তিক আর্তনাদ যখন সেটা এক 'নিক' থেকে আরেক 'নিক'-এ (চলন্ত অবস্থায় গাড়ির চাকার আঘাতে তৈরি লম্বা অল্প গভীর দাগ) পড়ে ঝাঁকিয়ে উঠছিল, আর কোচম্যানের চাবুকের শীৎকার। এই সবকিছুই মনে হচ্ছিল যেন একটা ঘূর্ণিবাতাস যা আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল দূর থেকে আরো অনেক দূরে।

সামনের লোহার জালের ফাঁক দিয়ে আমার চোখ যান্ত্রিকভাবে গিয়ে থামে বিসেত্রে-এর মূল দরজার ওপরে বিরাট বিরাট অক্ষরে খোদাই করে লেখা 'বুড়ো মানুষদের বাড়ি' কথাগুলোর ওপর।

'বা-বাবা-বা-বাহ্'—আমি ভাবলাম—'তাহলে মানুষজন এখানে অবসর জীবন কাটায়!'

তন্দ্রা ও জাগরণের মধ্যবর্তী সময়ে আমরা যেমন করি, তেমনি করে আমি এই চিন্তাটা বারংবার নাড়াচাড়া করলাম আমার যন্ত্রণা-কাতর মনের মধ্যে। হঠাৎ গাড়িটা একটা বাঁক নিয়ে বড় রাস্তার ওপর গিয়ে পড়লো এবং লোহার জালের ফাঁক দিয়ে

BanglaBook.org

আমার দেখতে থাকা দৃশ্যপটও বদলে গেল। তখন সেখানে ফ্রেমবন্দী হয়ে ধরা পড়ছিল নটরডেম-এর টাওয়ারগুলো, প্যারিসের কুয়াশায় নীলচে এবং অর্ধেক দৃশ্যময়। এজন্যেই হয়তো আমার মনের মধ্যেকার ছবিও বদলে গেল আমার গাড়িটার মতোই আমিও যান্ত্রিক হয়ে গেছিলাম। বিসেথ্রে-এর ছবির চিন্তার বদলে নটরডেম-টাওয়ারের চিন্তার ছায়াপাত। 'যারা টাওয়ারের ফ্ল্যাগ পোল-এর নিচে দাঁড়িয়ে তারা বেশ ভালো দেখতে পাবে'—বোকার মতো হেসে নিজের মনেই ভেবেছিলাম।

মনে হয় ঠিক সেই সময়েই যাজক সাহেব আরো একবার আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। চাকার ঘর্ঘর আওয়াজে, ঘোড়ার খুরের শব্দে আর কোচম্যানের চাবুকের শীৎকারে আমার কান মাথা তখনো ভোঁ ভোঁ করছিল। যে কোনো কথা সেজন্য, তখন আমার কাছে শুধু একটা আওয়াজ বলেই মনে হচ্ছিল।

ওঁর একঘেয়ে কথার আওয়াজ নিরবেই শুনতে শুনতে আমার একটা অদ্ভুত ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। ওঁর কথা ঝর্না সঙ্গীতের মতো বয়ে যাচ্ছিল আমার পাশ দিয়ে যা কখনোই একসুরে মনে হচ্ছিল না আবার খুব যেন আলাদাও নয়। ঠিক বড় রাস্তার ধারে বুনো ছায়াগাছেদের মতো। ঠিক সেই সময় উইজেঁর কর্কশ কণ্ঠ হঠাৎই আমাকে আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে জাগিয়ে তুললো। বেশ খুশি খুশি গলাতেই সে জিজ্ঞেস করলো—'তাহলে ফাদার বলুন তো নতুন খবর কী আছে?' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে তার দেহটা ফাদারের দিকে বাঁকিয়ে দিল।

যাজক মশাই কিন্তু আমাকে উদ্দেশ্য করে তাঁর কথা বলা থামাননি এবং গাড়ির আওয়াজে ওর কথা শুনতে না পেয়ে কোনো উত্তরও দেননি।

'এই যে শুনছেন'—উইজেঁ গাড়ির আওয়াজকে ছাপিয়ে যেতে চাইলো—'বলছিলাম কি যে... ... চুলোয় যাক হতচ্ছাড়া গাড়ি!'

সত্যিই গাড়িটার চুলোয় যাবারই তো কথা!

সে বলতেই থাকলো—'ওফ্, রাস্তার এই আওয়াজ কথা বলার ইচ্ছেটাকেই মাটি করে দেয়। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম—ওহো, ফাদার, যা বলছিলাম আপনি কি তা শুনতে পেয়েছেন? অর্থাৎ, আজ প্যারিসের টাটকা খবর কী?'

আমি শিউরে উঠলাম। মনে হলো সে বুঝি বা আমার কথাই বলছে।

এতক্ষণে ফাদার বোধহয় তার কথা শুনতে পেলেন। বললেন—'দুঃখিত, সকালে আজ খবরের কাগজ উল্টে দেখারই সময় পাইনি। সন্ধ্যার আগে কিছু জানতেও পারবো না। আসলে যখন সারাটা দিন এইরকম ব্যস্ত থাকি তখন দারোয়ানকে বলে রাখি কাগজগুলো যত্ন করে গুছিয়ে রাখতে যাতে ফিরে গিয়ে পড়তে পারি।'

ফাদারকে থামিয়ে দিয়ে উইজেঁ বলে ওঠে—'ধুস্ কি যে বলেন। না পড়লেও কোনোভাবে শুনেছেন নিশ্চয়ই। আজকের প্যারিসের খবর! সকাল বেলার মুখ্য খবর!'

আমি বলে উঠলাম—'সেটা বোধহয় আমি জানি।'

BanglaBook.org

উইজেঁ আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে বললো—'আপনি?' আপনি কীভাবে জানবেন? যাইহোক, যদি জেনেই থাকেন তাহলে খবরটা বলেই ফেলুন!'

আমি প্রত্যুত্তরে বললাম—'শোনার জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব মনে হচ্ছে!'

জবাবে ও বললো—'কেন হবো না মশাই। প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত আছে এবং এটা খুবই অবিচার করা হবে যদি আমি ভেবে নিই যে আপনার সেটা থাকতে পারে না। ভালো কথা আমি কিন্তু ন্যাশনাল গার্ডকে[১০] সম্পূর্ণ ঢেলে সাজানোর পক্ষে। আমি আমার কোম্পানীর সার্জেন্ট ছিলাম, যদিও ভালো সময় উপভোগ আমরা খুব একটা করতে পারিনি।'

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম—'না, এ ব্যাপারটার সঙ্গে ওটার কোনো সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না।'

'তাহলে দিনের বিশেষ খবরটা বলেই ফেলুন যদি সেটা আপনি জানেন বলে এখনো দাবি করেন।'

'আমি আজকের প্যারিসের অন্য একটা মুখ্য আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়ে কথা বলতে চাইছিলাম।'

কিন্তু বোকাটা কিছুই বুঝতে পারলো না, শুধু ওর জানার ইচ্ছেটা আরো প্রবল হলো।

'আমি যেটা বললাম সেটা ছাড়াও অন্য খবর? আশ্চর্য! কিন্তু শয়তানের দোহাই, খবরটা আপনি পেলেন কীভাবে? অবাক হচ্ছি এটা ভেবে যে কী করে আপনি আমার চেয়েও বেশি জানেন! যাইহোক খবরটা যে কী সেটা তাড়াতাড়ি করে বলে ফেলুন তো মশাই—প্লিজ দেখতেই তো পাচ্ছেন কেমন হাঁক পাঁক করছি। প্রেসিডেন্ট অব দ্য কোর্ট-কে যখন বলবো না খবরটা! ওফ, আগেভাগে খবর পেতে উনি এত্তো ভালোবাসেন!'

এই ধরনের বোকামো আরো খানিকক্ষণ চললো। ও একবার ফাদারের দিকে এবং একবার আমার দিকে তাকাতে লাগলো। আর আমার জবাব বলতে শুধু একবার কাঁধ ঝাঁকানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

'মনের মধ্যে কী আছে সেটা একটু ঝেড়ে কাশুন তো মশাই'—ও প্রায় ধমকেই উঠলো যেন। আমি জবাবে বললাম—'আমার মনের মধ্যে এখন যা আছে তা হলো যে আজ সন্ধ্যায় আমার মনে আর কিছুই থাকবে না।'

'ওফ্, ওটাই কি সব নাকি?' সে বললো—'আরে এর জন্যে এত ভেঙে পড়ার কী আছে। ড. কাঁস্তা তো এইসময় বেজায় বকবক করেছিলেন।' তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ও আবার শুরু করে—'আমি মসিয়ে পাপাভঁয়্যা-কেও সঙ্গ দিয়েছি। উনি একটা ওটারের চামড়ার টুপি পরে ছিলেন আর সিগার খাচ্ছিলেন। কিন্তু লা রোচেলে-এর চ্যাংড়াগুলো শুধু নিজেদের ভেতরেই কথাবার্তা চালিয়ে গিয়েছিল। যাইহোক, তবু তারা কথা তো বলছিল।' আরো একবার দম নিয়ে সে আবার বলতে শুরু করলো—'যত্তোসব পাগলের দল! ধর্মোন্মাদ! মনে হচ্ছিল ওরা বুঝি পৃথিবীর

BanglaBook.org

সবাইকেই ঘৃণা করে। কিন্তু তরুণ বন্ধু আমার, আপনার সমস্যাটা হচ্ছে আপনি নিজেকে বড় বেশি গুটিয়ে রাখেন।'

'আমি আপনার তরুণ বন্ধু? জেনে রাখুন মশাই, আমার বয়স আপনার চেয়ে অনেক বেশি। প্রতি পনেরো মিনিটে আমার বয়স এক বছর করে বেড়ে যাচ্ছে সে খবরটা কি রাখেন?'

আমার দিকে ঘুরে সে কয়েক মিনিট ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েই রইলো কারণ আমার কথাগুলো বোঝার জন্য তাকে যে রীতিমতো কষ্ট করতে হচ্ছিল তা বোঝাই যাচ্ছিল। তারপর সে সবজান্তা দেঁতো হাসতে হাসতে বললো—'মাইরি, পেয়েছেন যাহোক আমাকে! আমার চেয়ে বয়স বেশি? কিন্তু আমি যে আপনার দাদু হতে পারতাম!'

খুব গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম—'আমি কিন্তু একটুও ঠাট্টা করছি না।' এরপর ও তার নস্যির ডিবেটা খুলে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো—'মশাই, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে এক টিপ নিন আর প্লিজ, আমার সম্পর্কে যেন কোনো খারাপ ধারণা পুষে রাখবেন না।'

'আরে ওই ব্যাপারে চিন্তা না করাটাই ভালো। কারণ যদি সেটা ঘটেও তাহলে তার স্থায়িত্ব তো বেশিক্ষণ হবে না।'

গাড়িটা একটা নিকে পড়ে লাফিয়ে উঠলো। আর ওর বাড়ানো হাতে ধরা নস্যির ডিবেটা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী লোহার জালের গায়ে সজোরে ঠুঁকে যেতেই নস্যির ডিবেটার সব নস্যি উল্টে গেল একজন রক্ষীর পায়ের নিচে।

'উচ্ছন্নে যাক্ হতচ্ছাড়া গ্রিল!' উইজেঁ চিৎকার করে উঠলো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—'পোড়া কপাল দেখেছেন আমার! সবটাই পড়ে গেল।'

আমি একটু মুচকি হেসে জবাব দিলাম—'আমার কপালটা কিন্তু আপনার চেয়েও খারাপ।'

আপন মনে গজ গজ করতে করতে মাটি থেকে সে ওপর ওপর নস্যিটা যতটা সম্ভব কুড়োবার চেষ্টা করছিল।

'আমার চেয়েও খারাপ বলাটা খুব সহজ তাই না? প্যারিস যেতে এই যে এতটা পথ পার হতে হবে—তাও আবার নস্যি ছাড়া—ব্যাপারটা খুবই পীড়াদায়ক নয় কি?'

ফাদার ওকে এরপর ক'টা সান্ত্বনার কথা শোনালেন। আমার মনটা যদিও তখন অন্য কোথাও ছিল তবু আমার মনে হলো যে, প্রথমে আমি যে উপদেশামৃত তাঁর কাছে শুনতে বাধ্য হয়েছিলাম এটা তারই দ্বিতীয় পর্ব। ক্রমে ক্রমে অবশ্য ফাদার ও উইজেঁ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় মজে গেলেন। আমি ওদের কথাবার্তায় কোনো বিঘ্ন ঘটালাম না কারণ আমার তো তখন ভাবনা শুরুর সময়।

শহরের উপকণ্ঠে যখন আমরা এসে পৌঁছালাম তখনো হয়তো আমার মনটা অন্য কোথাও ছিল। নাহলে প্যারিসকে চিরাচরিতের তুলনায় আমার বেশি কোলাহলমুখর মনে হবে কেন!

BanglaBook.org

গাড়িটা এক জায়গায় চুঙ্গী কর বা টোল টেক্স দেবার জন্য থামলো। কর আদায়কারী অফিসাররা সেটাকে ভালো করে দেখলো। যদি কোনো ভেড়া বা ষাঁড়কে কোতল করতে নিয়ে যাওয়া হতো তাহলে রুপার চাকতি ওরা নজরানা হিসেবে পেয়ে যেতো। কিন্তু মানুষের মাথার জন্য কিছুই না। কাজেই বিনা বাধায় আমরা জায়গাটা পেরিয়ে গেলাম। রাজপথ ছেড়ে আসতেই গাড়িটা বেশ টগবগ করে সেন্ট মারসাউ ও সিটে ডিস্ট্রিক্টের পুরনো আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে ছুটতে থাকলো। ওই রাস্তাগুলো এমনভাবে বাঁক নিয়েছিল ও একে অপরের ওপর দিয়ে গিয়েছিল যে দেখলে মনে হবে যেন ওগুলো একটা উইঢিবির মধ্যেকার হাজার সুরঙ্গপথ। ওইসব সরু পাথুরে রাস্তা দিয়ে গাড়িটা এত জোর শব্দ করতে করতে ছুটছিল যে বাইরের আর কোনো আওয়াজই আমাদের কানে ঢুকছিল না। ছোট্ট, চৌকো খুপড়িটার মধ্যে দিয়ে বাইরে তাকাতে দেখলাম যে চলমান জনস্রোত থমকে দাঁড়িয়ে আমাদের গাড়িটাকে দেখছে আর বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো দৌড়াতে দৌড়াতে গাড়িটার সঙ্গে সঙ্গে আসছে। সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় ছেঁড়া খোঁড়া পোশাক পরা বুড়ো বুড়িরা ভিড় করে রয়েছে এখানে ওখানে। ওদের মুখগুলো ঠান্ডার কামড়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো। তবু ওদের হাতে তুলে ধরা আছে রঙিন প্ল্যাকার্ড যাতে লেখা অধিকার আদায় করে নেওয়ার শপথ বাক্য।

যখন আমরা জেলখানার প্রধান দরজার কাছে এসে পৌঁছালাম প্যালাইস দ্য জাষ্টিস-এর ঘড়িতে তখন ঠিক সাড়ে আটটা। বিরাট বিরাট সিঁড়িগুলো, কালো রঙের গির্জা ও বিষণ্ন গম্ভীর তোরণ-গৃহগুলো দেখেই আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। আমাদের গাড়িটা থেমে যেতেই আমার মনে হয়েছিল যে বুকটাও বোধকরি এবার চলা বন্ধ করে দেবে।

আমি আমার অবশিষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে নিলাম; বিদ্যুতের মতো, বিশাল লোহার দরজাটা খুলে গেলে আমাকে গাড়ি থেকে নামতে হলো। গেটের দু'ধারে দাঁড়ানো সশস্ত্র রক্ষীবাহিনীর মাঝখান দিয়ে আমার চলা শুরু। এর মধ্যেই জনতা কিন্তু জমা হওয়ার জন্যে অনেকখানি সময় পেয়ে গেছে।

২৩.

সাধারণ দর্শকদের তুষ্টির জন্য প্যালাইস দ্য জাষ্টিস-এ বসবার উদ্দেশ্যে যে লম্বা লম্বা বেঞ্চির বন্দোবস্ত করা আছে তার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে খানিকটা সহজ ও চিন্তামুক্ত লাগছিল। কিন্তু যখন আমাকে নিচু দরজা দিয়ে, লুকানো সিঁড়ি দিয়ে, ভেতরের সরু পথ দিয়ে ও বেজায় বড় সড়, লম্বা, দুর্গন্ধযুক্ত আর চাপা শব্দমুখর দালানের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, যেখান দিয়ে সাধারণত কারারক্ষীরা ও দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত কয়েদীরাই যাওয়া আসা করে, তখনই যেন আমার সব সাহস অন্তর্হিত হলো।

BanglaBook.org

সেই উইজেঁ কিন্তু তখনো আমার পাশে পাশেই ছিল। ফাদার ঘণ্টা দুয়েকের জন্য চলে গিয়েছিলেন অন্য কাজ সারতে।

আমাকে গভর্নর-এর অফিসে নিয়ে গিয়ে সেখানে উইজেঁ-এর হেফাজতেই বসিয়ে রাখা হলো। আসলে ব্যাপারটা ছিল বদলা-বদলির। সুতরাং গভর্নর ওকে বলে গেলেন একটু অপেক্ষা করতে কারণ তাঁর হেফাজতে থাকা একজন বন্দিকে তিনি উইজেঁ-এর হাতে তুলে দিতে চান। একটুও বিলম্ব না করে বন্দিটিকে নিয়ে যেতে হবে ফিরতি গাড়িতে বিসেত্রে-তে। কোনো সন্দেহ নেই যে এই বন্দিটিই সেই লোক যাকে আজই শাস্তির রায় শোনানো হয়েছে। ও হয়তো আজ রাতে সেই খড়ের বিছানায় ঘুমাবে যে বিছানার খড় আমি সময়ের অভাবে ক্ষয় করে দিতে পারিনি।

'বাহ্', উইজেঁ গভর্নর সাহেবকে বলে উঠলো, 'তাহলে একটু অপেক্ষাই করা যাক। এক্ষুণি যদি দুটো রিপোর্টই তৈরি করে ফেলা যায় তাহলে বেশ ভালোই হয়।'

এই সময়টাতে আমাকে গভর্নর সাহেবের অফিস ঘরের লাগোয়া একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। একটা ছিটকিনি বন্ধ দরজার পেছনে আমি একাই ছিলাম।

সেই সময়টাতে কী যে ভাবছিলাম অথবা কতক্ষণই বা আমি সেখানে বন্দি ছিলাম জানি না। তবে দিবাস্বপ্ন যে দেখছিলাম এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। হঠাৎই একটা কর্কশ অট্টহাসির আওয়াজে আমার দিবাস্বপ্ন ভেঙে চুড়ে তছনছ হয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে আমি তাকালাম। আমার ঘরে তখন আর আমি একা নই। আরো একজন সেখানে উপস্থিত। পঞ্চাশ পঞ্চান্ন মতো বয়স, গাঁট্টাগোট্টা, মাঝারি উচ্চতা, গায়ের চামড়া কোঁচকানো, কুঁজো, মাথার চুল সাদা হতে শুরু করেছে। ওর ঠোঁটে ঘৃণামিশ্রিত বিদ্রূপের বাঁকা হাসি। লোকটা বেশ নোংরা। পরনের পোশাক জরাজীর্ণ হওয়ার কারণে প্রায় অর্দ্ধ উলঙ্গ। ওকে দেখলে ঘেন্না লাগার অনুভূতি ছাড়া আর কিছু হয় না।

BanglaBook.org

বুঝলাম, দরজাটা কোনো এক সময় খোলা হয়েছিল ওকে ঘরে ঢোকানোর জন্য। তারপর বন্ধও করা হয়েছিল। কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। ওফ্, আমার মৃত্যুটাও যদি এভাবে আসতো!

কয়েক মুহূর্ত আমি আর ওই লোকটা পরস্পরের দিকে তাকিয়েই ছিলাম। ও তার বীভৎস হাসিটা বজায় রেখেছিল দেখে পর্যায়ক্রমে আমি হতচকিত হয়েছিলাম ও ভীষণ ভয়ও পেয়েছিলাম।

'তুমি কে? এখানে কী করছো?' আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

'এ জায়গাটা কেমন দেখতে জানো?' সে উত্তর দিল, 'রক্তমাখা নরকের উপকণ্ঠস্থিত স্থান যেমন দেখতে হয় ঠি-ই-ই-ক তেমনি?'

'নরকের উপকণ্ঠস্থিত স্থান?' 'কিন্তু এর অর্থ কী?' আমার প্রশ্নটা ওর আমোদটাই যেন বাড়িয়ে দিল।

'এর মানে হচ্ছে,' সে হাসির দমকে কাশতে কাশতে বললো, 'যে ছ'সপ্তাহের মধ্যে আমার ভাবনা চিন্তা করে অপরাধ করার চূড়াটা ঘাতকের বাক্সে গিয়ে ঢুকবে।

অর্থাৎ কিনা মুণ্ডু ঘাড় থেকে নেমে যাবে। আর আমারটা নিয়ে দু-দুটো হবে—হা-হা, —হা। আমি বুঝতে পারছি বেশ যে সময় গোনা শুরু হয়ে গেছে।'

কোনো সন্দেহ নেই যে ভয়ে আমি বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলাম আর আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ এই লোকটি হচ্ছে গিলোটিনের আর এক শিকার যাকে আজই দণ্ডাদেশ শোনানো হয়েছে এবং আজই ওকে বিসেত্রে-এর সেই কয়েদঘরে নিয়ে গিয়ে রাখা হবে যেটা আমি ওর জন্যই বোধকরি আজ সকালে খালি করে এসেছি।

লোকটা বকবক করতেই থাকলো—'আমার গপ্‌পোটা হচ্ছে মোটামুটি এরকম, তার কোনো দাম থাকুক বা না থাকুক। আমি এক ধূর্ত বদমাইশের পোলা। কিন্তু কপাল মন্দ হলে যা হয় আর কি। বুড়ো চার্লি একদিন তার বন্দোবস্ত করে ফেললো। সে সময়েও ঈশ্বরের কৃপায় ফাঁসি কাঠের শাসন জারী ছিল। অতএব মাত্র ছ'বছর বয়সেই আমার না রইলো বাপ, না রইলো মা। গরমের দিনে আমি ঠেলাগাড়ির চাকা ঘোরানোর কাজ করতাম বড় রাস্তায় ধুলোর মধ্যে। তা দেখে লোকজনেরা তাদের গাড়ির মধ্যে থেকে দু-এক পেনি আমার দিকে ছুঁড়ে দিতো। শীতের দিনে খালি পায়ে আমাকে কাদার মধ্য দিয়ে হাঁটতে হতো। আমার মুখের গরম হাওয়া আমি আমার ঠান্ডায় জমে যাওয়া আঙুলগুলোয় ছড়িয়ে দিতাম। প্যান্টের মধ্যে দিয়ে আমার পাগুলো দেখা যেতো। যখন আমার ন'বছর বয়স তখন থেকেই আমি আমার আঙুলগুলোর উপর ভরসা করতে শিখলাম। প্রায়ই দু-চারটে মানিব্যাগ কোটের পকেট কেটে হালকা করতাম। দশ বছর যখন আমার বয়স তখনই আমি এক প্রতিশ্রুতিবান পাকা তরুণ পকেটমার হয়ে উঠলাম। এবার আবার বেশ কিছু ভালো দোসরও আমার জুটে গেল। ফলে সতেরো বছরেই আমি একজন পাকা চোর। সিঁদকাটা, দোকান লুট, এসব তখন আমার কাছে জলভাত। একদিন অবশেষে ধরা পড়লাম এবং সেটা যেহেতু খুব একটা কম বয়সে নয় তাই জুনিয়ার নেভীতে দাঁড়াতে আমার ঠাঁই হলো না। আমাকে জাহাজি জীবনই যাপন করতে হলো। তবে সেটা বেশ কঠিন ছিল। তক্তার ওপর শোও, স্রেফ সাদা পানি আর কালো রুটি খাও। রমণী সম্ভোগের কথা মনেও এনো না। সূর্যকিরণ যেমন তোমাকে জ্বালিয়ে দেবে তেমনি ব্যতিব্যস্ত করে মারবে রক্ষীগুলো। ওরা তোমার চুলগুলোকেও কেটে দেবে। ওফ্, আমার যে কি সুন্দরই না বাদামি চুল ছিল। যাইহোক, আমার শাস্তি কাল আমি সেখানে শেষমেষ কাটাতে পেরেছিলাম। দীর্ঘ পনেরোটা বছর। তাও কিনা মাত্তর একটা খুনের জন্য! আমার বয়স তখন হয়ে গিয়েছিল বত্রিশ। একদিন সকালে আমাকে ছাড়পত্র দেওয়া হলো। সঙ্গে ছেষট্টি ফ্রাঙ্ক যা নাকি আমি বন্দি থাকা কালীন জাহাজে কাজ করার সুবাদে জমিয়েছি। ওফ্, প্রতিদিন ষোলো ঘণ্টা কাজ। হাড়ভাঙা পরিশ্রম। মাসে ত্রিশ দিনই আর বছরের বারোটা মাসই। তবু আমি আমার ছেঁড়া পোশাকের নিচে পাদ্রীদের মতোই একটা সৎ মন এবং ওই ছেষট্টি ফ্রাঙ্ক নিয়ে সোজা চলে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই হতচ্ছাড়া পাসপোর্ট! তার রঙটা যে হলুদ[১১] আর ওপরে লেখা 'মুক্তি পাওয়া আসামী।' সুতরাং আমি যেখানেই যাই না কেন সেটা আমাকে দেখাতেই হতো। যেখানে আমি বাসা বেঁধেছিলাম সেই গ্রামের মেয়রের কাছে

BanglaBook.org

ওটা নিয়ে আমাকে প্রত্যেক সপ্তাহে হাজিরা দিতে হতো। 'বাহ্, চমৎকার প্রশংসাপত্র তো! একটা আধফোটা আসামী'! সুতরাং মানুষজন আমাকে ভয় পেতো। বাচ্চারা আমাকে দেখলেই ছুটে পালাতো। আর আমার মুখের সামনে সব বাড়ির দরজাগুলোই বন্ধ হয়ে যেত। কেউ আমাকে কাজ দিতো না। ফলত আমার ছেষট্টি ফ্রাঙ্ক বেশ তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ হওয়ার পরও তো আমাকে বাঁচতে হতো। আমি যথেষ্ট বলশালী ছিলাম এবং যে কোনোরকম কঠিন কাজকেও বিন্দুমাত্র ভয় পেতাম না। কিন্তু কেউই তো তা বুঝতে চাইতো না। যদিও বা কেউ কাজ দিতো সেটা হয় পনেরো সউ (ফ্রান্সের খুব কম মূল্যমানের মুদ্রা) অথবা দশ অথবা পাঁচের বিনিময়ে। কেউ কেউ আবার কিছুই দিতোও না। কিন্তু তখন আমার আর কি-ই বা করার ছিল? একদিন আমার ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছিল। পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একটা পাউরুটির দোকানের জানালা কনুই দিয়ে ভেঙে একটা রুটি চুরি করতে গিয়ে দোকানের মালিকের কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেলাম। রুটিটা খেতে তো পেলামই না বদলে পেলাম সারা জীবনের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড। আমার কাঁধে তিনটি অক্ষর দেগে দেওয়া হলো। যদি চাও তো এখনো দেখতে পারো। উকিলরা এটাকে আমার পরবর্তী অপরাধ বলে গণ্য করলো। সুতরাং এখন আমি এক দামী আসামী। ফলে আমাকে আবার তৌলু-তে ফেরত পাঠানো হলো। তবে এবার সবুজ টুপিওয়ালাদের সঙ্গে। এ অবস্থায় আমাকে পালাতেই হতো। আর সেটা করতে গেলে তিনটি দেওয়ালে সিঁধ কাটতে হতো, দু-দুটো শেকল ঘষে ঘষে কাটতে হতো। আমার কাছে একটা পেরেক তখনো মজুত ছিল। সুতরাং যেভাবেই হোক আমি পালাতে পারলাম। সঙ্গে সঙ্গে সাবধানতাসূচক কামান দাগা হলো। কারণ আমরা দাগী আসামীরা দেখতে ছিলাম রোমের উচ্চপদস্থ ধর্মপ্রচারকদের মতো, পোশাক একেবারে লালে লাল। আমরা যখন যাত্রা শুরু করতাম তখনই কামান দাগা হতো। অবশ্যই গোলাগুলো মাইলখানেক দূর দিয়ে চলে যেতো। এই সময় কিন্তু আমার কাছে যেমন কোনো হলুদ পাসপোর্ট ছিল না তেমনি আবার কোনো টাকা পয়সাও ছিল না। কিছু পুরনো কয়েদীর সঙ্গে এবার আমার দেখা হলো যাদের মধ্যে কেউ কেউ পুরো কারাবাস করেছে আবার কেউ কেউ পলাতক আসামী। ওদের দলপতি আমাকে জিজ্ঞেস করলো দু-চারটে খালাসে আমার কোনো আপত্তি আছে কি না। উত্তরে আমি ওদের দলে নাম লেখালাম এবং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিয়মিত খুন করতে লাগলাম। শিকার হতো কখনো বা কোনো অশ্বশকট কখনো বা মেলভ্যান আবার কখনো বা গরু ভেড়া বিক্রি করে ফেরা কোনো অশ্বারোহী। আমরা টাকাপয়সাগুলো আত্মসাৎ করে গাড়িগুলোকে ওদের মর্জিমাফিক চলে যেতে দিতাম। লাশ পুঁতে ফেলতাম এমনভাবে কোনো একটা গাছের তলায় যেন তার পা মাটির ওপর উঠে না থাকে। তারপর আমরা তার সমাধির ওপর সবাই মিলে নাচানাচি করতাম যাতে মাটি ভালোভাবে বসে যায়। সুতরাং এভাবেই আমার জীবন কেটেছে। ঝোপে ঝাড়ে লুকিয়ে থেকে। খোলা আকাশের নিচে ঘুমিয়ে, তাড়া খেয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে বেড়িয়ে, তবুও আমার আমিত্বটুকু নিয়ে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু

BanglaBook.org

প্রত্যেকটা জিনিসেরই তো একটা শেষ আছে। এক রাতে পুলিশের জালে ফেঁসে গেলাম। আমার বন্ধুরা দৌড় লাগালো। কিন্তু বয়সের ভারে ওদের মতো দৌড়াতে পারলাম না বলে ধরা পড়ে গেলাম শেষমেষ। আমাকে এইখানে নিয়ে আসা হলো। ফাঁসির মঞ্চের প্রথম সিঁড়িটার থেকে এক পা মাত্র দূরে। এখন আমি একটা রুমালই চুরি করি অথবা একটা খুনই করি ব্যাপারটা একই। কারণ আমি তো দাগী আসামী... সুতরাং আমার ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঠিকই আছে। অন্যথায় তো সেই একই কাজ করবো আবার। তাই খুব তাড়াতাড়ি সই সাবুদ করে, সীলমোহর মেরে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল আমার ভাগ্যটা। আর সত্যি বলতে কি আমি নিজেও তো যথেষ্ট বুড়ো ও জবুথবু হয়ে পড়ছিলাম। আমার বাপটাকেও লটকে দেওয়া হয়েছিল। আর এবার ওরা আমাকে নিয়ে পড়েছে। তাই এখানেই আমার নটে গাছটি মুরোল বন্ধু।'

আমি বোবার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনছিলাম। তাই না দেখে ও আগের চেয়েও অনেক বেশি জোরে হাসিতে ফেটে পড়লো আর আমার হাতটা ধরার চেষ্টা করলো। কিন্তু বেদম ভয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেলাম। তখন সে আমাকে বললো—'দেখো বন্ধু, তোমাকে দেখে কেউই সস্তার মাল বলবে না। কিন্তু ডাক পড়লে তোমাকে পাছা শক্ত করে দাঁড়াতেই হবে। লটকানোর জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় তোমাকে তোলা হলে ভয় তোমার লাগবেই। তবে সয়ে যেতে সময় লাগবে না। কারণ তারপর বেশি সময় তো তুমি পাবে না। ওফ্, আমি যদি নিজে গিয়ে গোটা ব্যাপারটা তোমাকে দেখাতে পারতাম। মাইরি বলছি, আপীল টাপীল করার কোনো ইচ্ছেই যখন আমার নেই তখন আমাদের দু'জনকে একই সঙ্গে খালাস করে দিলেই তো পারতো! আর সেই একই পুরুত যখন আমাদের দু'জনকেই নামকেত্তন শোনাবে। তোমার সঙ্গে শেষ খাওয়াটা যখন এক থালাতে খেতেও আমার কোনো আপত্তি নেই তখন এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারতো। এবার বল তো দোস্ত, আমি তোমার সত্যিকারের ইয়ার কি না? আরে, কি আর বলবে। তাহলে ওই কথাই রইলো দোস্ত! বলে সে আরো এক পা এগিয়ে আমার কাছাকাছি এলো।

আমি তাড়াতাড়ি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললাম—'মহাশয়, অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আপনার বন্ধুত্ব গ্রহণের কোনো ইচ্ছাই আমার নেই।'

সে এবার হো হো করে হেসে উঠে বলল—'আরি ব্বাস, কি একটা বলল যেন মাইরি! মহাশয়—তাই না? বেড়ে! তার মানে আমরাও ভদ্দরলোক? আরে ওই মালটা সবাই আমাকে বলুক এটাই তো চাই ম-হা-শ-য়!'

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম—'বন্ধু, আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন। অনেক কিছু ভাবতে হবে এখন। তাই অনুগ্রহ করে যদি আমাকে একটু একা থাকতে দেন বাধিত হবো।' আমার গম্ভীর গলার স্বর তাকেও হঠাৎই যেন চিন্তাশীল করে তুলল। খোলা সার্টের নিচে লোমশ বুকটা চুলকাতে চুলকাতে সে-ও তার কাঁচা পাকা চুলের মাঝে টাক পড়া মাথাটি ঝাঁকালো। খুব নিচু স্বরে তারপর সে বিড়বিড় করে উঠলো—'পুরুত মশাই-এর দৃষ্টি এখন ওর দিকে। তাই থাক্। আর কোনো কথা

BanglaBook.org

নয়।' অবশেষে কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর একটু ভয়ে ভয়েই যেন সে আমাকে বললো—'ভদ্রলোক হই ছাই না হই তোমার কোটটা কিন্তু দারুণ পছন্দসই। গিলোটিনের চালক ওটা দেখলেই তো ছোঁ মেরে নিয়ে নেবে। তার চেয়ে এখানেই ওটা দিয়ে যাও না। তাহলে মালটা দিয়ে একটু তামাক টামাক খেতে পাই।'

আমি কোনো কথা না বলে কোটটা খুলে ওকে দিয়ে দিলাম। কোটটা পেয়ে খুশিতে ও একটা বাচ্চাছেলের মতো হাততালি দিতে থাকলো। কিন্তু পরক্ষণেই শুধু একটা শার্ট পরা অবস্থায়, আমাকে ঠকঠক করে কাঁপতে দেখে লোকটা বলে উঠলো—'ও মশাই, তুমি তো কেঁপে মরছো দেখছি। নাও, নাও এটা শিগগির পরে নাও তাছাড়া বৃষ্টি পড়ছে যা তাতে ভিজে এক্কেবারে গোবর হয়ে যাবে। তাছাড়া গাড়িতে তোমাকে যাতে বেশ মানানসই লাগে সেটাও তো দেখতে হবে।'

বলতে বলতে ও তার খসখসে ধূসর উলের জ্যাকেটটা খুলে আমাকে পরিয়ে দিল। আমিও এতে কোনো আপত্তি করলাম না।

এরপর আমি খানিকটা দূরে গিয়ে একটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষটার ব্যবহার হতচকিতের মতো ভাবতেই থাকলাম। সে আমার দেওয়া কোটটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে আর আনন্দে মাঝে মধ্যেই নিজের মনে কথা বলতে বলতে চিৎকার করে উঠছে।

'উরি শ্লা, পকেটগুলো এক্কেবারে নতুনের মতো! কলারও বেশ ভালো আছে! এটার বদলে আরামসে পনেরো ফ্রাঙ্ক পেতেই পারি। একেই বলে ভাগ্য! টিকে থাকার জন্যে ছ'সপ্তাহের তামাকের বন্দোবস্ত তাহলে হলো।'

আরো একবার দরজাটা খুলে গেল। এবার ওরা এলো আমাদের দু'জনার জন্যেই আমাকে সেই ঘরটাতে ঢুকতে হবে যেখানে দণ্ডিত মানুষেরা শেষ সময় না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আর ওকে যেতে হবে বিসেত্রে-তে।

তখনো হাসতে হাসতে লোকটা পাহারাদারদের মাঝখানে গিয়ে ওদের বলতে থাকলো—'ওই ভদ্দরলোক আর আমার মধ্যে যেন ঘুলিয়ে ফেলো না তোমরা। উনি আর আমি আমাদের কোটটাই যা বদলা বদলি করেছি। আর এর জন্যে তোমরা যে ওঁর বদলে আমাকে নিয়ে যাচ্ছো না তার জন্যে ধন্যবাদ। ওফ্, তাহলে যা একখানা কান্ড বাধতো না! অন্তত যখন আমি সবেমাত্র তামাকের টাকার বন্দোবস্ত করতে পেরেছি!

২৪.

আমি কোটটা খুলতেই হতচ্ছাড়া বুড়ো শয়তানটা ওটা হাতিয়ে নিল আর ওর এই কদর্য ছেঁড়া কম্বলের টুকরোটা দিয়ে গেল—এর নাম বলল জ্যাকেট! এটা পরে আমাকে কেমন লাগবে?

এই যে আমি ওকে আমার কোটটা নিতে দিলাম সেটা অবশ্যই কোনো দান করার মানসিকতা অথবা জাগতিক জিনিসের ওপর অনাসক্তি বশত নয়। দিয়েছিলাম

BanglaBook.org

কারণ ব্যাটা আমার চেয়ে যে ঢের বেশি শক্তিশালী। যদি দেবো না বলতাম তাহলে ও আমাকে পিটিয়ে ছাতু করে দিতে পারতো। ওইরকম একটা লোককে দান টান করার ইচ্ছে আমার মরে গেলেও হতো না। কারণ ওকে ঘেন্না করা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনি। ওফ্, ওই হতচ্ছাড়া দাগী আসামীটাকে যদি টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পারতাম! আর তারপর ওর লাশটাকে বুটের নিচে থেঁতো করে দিতে পারতাম!

বুকের ভেতরটা আমার রাগে ও তিক্ততায় ভরে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমার পিত্তির থলেটাই বুঝিবা ফেটে গেছে। ওফ্ মৃত্যুভয় সবকিছু এত তেঁতো করে দেয়!

২৫.

ওরা আমাকে একটা কয়েদঘরে নিয়ে গেল। চারটে শক্তপোক্ত দেওয়াল, জানালায় অনেক গরাদ আর দরজায় মোটা মোটা ছিটকিনি।

আমি একটা টেবিল, একটা চেয়ার আর লেখার সরঞ্জাম চাইতে আমাকে সেগুলো দেওয়া হলো। তারপর আমি একটা খাট বিছানা চাইতে কারারক্ষী এমন অবাকভাবে আমার দিকে তাকালো যে, যেন বলতে চাইলো—'কি লাভ?'

তবুও ওরা ঘরটার কোণে একটা নড়বড়ে খাট কোনোমতে লাগিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু একইসঙ্গে আমার জন্যে একটা পাহারাদারেরও বন্দোবস্ত করা হলো আমার ঘরে। অবশ্য যদি সেটাকে ঘর বলা যায়। ওরা কি সত্যিই ভেবে নিয়েছিল নাকি যে খাট আর গদীর সাহায্যে আমি পালিয়ে যেতে পারবো?

BanglaBook.org

২৬.

এখন রাত দশটা।

ওফ্, আমার ছোট্ট মামণি! আর মাত্র ছ'ঘণ্টা। তারপরই তোর বাপী আর থাকবে না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ঘৃণার্হ বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে আমি পড়ে থাকবো লেকচার থিয়েটারের পাথরের ওপর। যার এক প্রান্তে আমার মাথাটার একটা ছাঁচ নেওয়া হবে আর অন্য প্রান্তে দেহটাকে টুকরো টুকরো করা হবে। তারপর একটা কফিনে সবটা পুরে কফিনটাকে ক্ল্যামার্ট-এর দিকে রওয়ানা করিয়ে দেওয়া হবে।

জানিস মামণি, যেমনটা বললাম ঠিক তেমনি তোর বাপীকে নিয়ে করা হবে। আর করবে সেই সব লোক যারা আমাকে কেউই কখনো ঘৃণা করেনি। যারা প্রত্যেকেই আমার জন্যে দুঃখিত। এবং ওরা ইচ্ছে করলেই আমাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। অথচ ওরাই যে আমাকে মেরে ফেলবে, কেটে টুকরো টুকরো করবে এই ব্যাপারটা কি তুই বুঝতে পারবি, মেরী? নির্বাক উৎসবের মধ্যে ঠান্ডা মাথায় ওরা

আমার মাথাটা কেটে ফেলবে জনসাধারণের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য! হা ঈশ্বর!

আমার ছোট্ট হতভাগী মামণি! তোর বাপি—যে তোকে এত ভালোবাসতো, যে তোর ছোট্ট গলা হাজার চুমোয় ভরিয়ে দিতো, যার হাত তোর কোঁকড়ানো সিল্কের মতো চুলে কোনোদিন ক্লান্ত হতো না, যে দু-হাতে তোর সুন্দর গোলগাল মুখটা ধরে অনুক্ষণ তার পানে চেয়ে থাকতো, যে তোকে হাঁটুর ওপর বসিয়ে কতদিন ঘোড়া ঘোড়া খেলতো, যে তোর ছোট্ট হাতদুটো প্রতি সন্ধ্যায় প্রার্থনাকালে জোড়া করে ধরে থাকতো—তোর সেই বাপী আর থাকবে নারে!

এইসব কাজগুলো এবার থেকে তোর জন্যে কে করবে আমার ছোট্ট সোনাই? কে আর তোকে এমন করে ভালোবাসবে? তোর বয়সী সব ছোট ছোট ফুলের মতো মেয়েদেরই বাবা থাকবে শুধু তোর ছাড়া। কেমন করে তুই শিখবি যে এরপর থেকে নববর্ষের উপহার, সুন্দর সুন্দর খেলনা, কেক, মিষ্টি এইসব আর তুই পাবি না? হতভাগী মামণি আমার, খাবার ছাড়া কেমন করে তুই বেঁচে থাকতে শিখবি?

ওফ্, জুরিরা যদি ওকে একবার দেখতো! আমার ছোট্ট ফুলের মতো মিষ্টি মেয়েকে! তাহলে ওরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতো যে ওরা শুধু একটা তিন বছরের শিশুর পিতাকেই হত্যা করছে না।

এবং যখন ও বড় হবে, অবশ্য যদি ততদিন ও বাঁচে তাহলে ও কী হবে? কোন পরিচয়ে বাঁচবে? ওর বাবা যে কুখ্যাত এক স্মৃতিমাত্র হয়ে প্যারিসে বেঁচে থাকবে। আমি ও আমার নাম ওকে তো লজ্জা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না! আমার মেয়ে বলে ওকে সবাই ঘেন্না করবে, ওর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবে, ওকে গালিগালাজ করবে আমার অপরাধের জন্যে। অথচ এই আমিই ওকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। মা আমার, তুমিও কি সেইদিন তোর এই হতভাগ্য বাবাটাকে ঘেন্না করবি? আমার জন্যে লজ্জিত হবি?

ওফ্, আমার এক ক্লেশদায়ক ভুল! কি অপরাধ যে আমি করেছি! আর কি এক অপরাধ যে আমি সমাজকে করতে বাধ্য করছি!

আচ্ছা এমনটা কি ঘটতে পারে না যে দিন ফুরোবার আগেই আমি মরে গেলাম? সত্যিই কি আমার বেলায় তেমনটা ঘটতে পারে না? কিন্তু বাইরে যে চাপা কথাবার্তার আওয়াজ আমি শুনতে পাচ্ছি। বুঝতে পারছি আনন্দিত দর্শককুল এখন থেকেই বাঁধের ধারে ভিড় জমাতে শুরু করেছে, পাহারাদারেরা, যারা ব্যারাকে প্রস্তুত হচ্ছে, কালো গাউন পরা ফাদার, আর লাল রঙে রাঙানো হাত নিয়ে ওই লোকগুলো—এ সবই কি আমার জন্যে? হ্যাঁ, তাই। কারণ আমাকে যে মরতে হবে। আমার মধ্যের এই মানুষটা যে এখনো বর্তমান, বেঁচে আছে, ঘুরছে ফিরছে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়ছে নিচ্ছে আর এই টেবিলের একদিকে বসে আছে যেটা অন্য যে কোনো একটা টেবিলেরই মতো এবং অন্য যে কোনো জায়গায় থাকতে পারতো—এসবই তো আমি নামে মানুষটাকে ঘিরে যে মানুষটাকে আমি ছুঁতে পারি,

BanglaBook.org

যার অনুভূতি আমি ভাগ করে নিতে পারি, যার কাপড়জামা আমার শরীরে জড়ানো আছে!

২৭.

কীভাবে যে সবটা করা হবে সেটা যদি জানতাম! জানি মুখ থুবড়ে মরে পড়ে থাকবো। ব্যাপারটা গোটাটাই যে ভয়ংকর তাও জানি। শুধু কীভাবে সেটাই জানি না।

গোটা ঘটনাটাই তো ভয়াবহ। এবং আমি বিন্দুমাত্রও অবহিত নই যে কেমন করে এতক্ষণ ধরে ওটার সম্বন্ধে বলতে বা লিখতে পেরেছি।

এই দশটা অক্ষরের[১২] সহাবস্থান, ওদের প্রকাশভঙ্গী ও বহিরঙ্গের আকার সবকিছুই তো ভয়ংকর কিছু ভেবে নেওয়ার পক্ষে ভীষণ অনুকূল। আর সেই নচ্ছার ডাক্তারটা যে এই ভয়ানক যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিল ও এর একটা নামও আগেভাগে ঠিক করে রেখেছিল!

এই 'ভয়ংকর' শব্দটির যে ছবি আমি ভেবেছি সেটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক। কারণ সেটা খুবই অস্পষ্ট ও খুবই অনির্দিষ্ট। এই শব্দটির প্রত্যেকটি বর্ণই যেন মেশিনটার এক একটি অংশ যার দৈত্যাকৃতি গড়ন যেন প্রতি মুহূর্তেই মনের মধ্যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে আবার নতুন করে গড়ে উঠছে।

ওটার সম্পর্কে আমার কোনো প্রশ্ন করতেও সাহস হয় না। অথচ ওটাকে যে সত্যিই কেমন দেখতে এবং কেমন ওর ব্যবহার সেটার ব্যাপারে কোনো জ্ঞান না থাকাটাও এত অস্বস্তিকর ও এত ভয় জাগানো। মনে হয় ওতে একটা দোদুল্যমান কাঠের তক্তা লাগানো আছে যেখানে কয়েদীকে উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হয়... উরি বাব্বা! আমার ক্ষেত্রে, মাথাটা গড়িয়ে পড়ার আগেই বোধহয় আমার সমস্ত চুল ভয়ে সাদা হয়ে যাবে।

২৮.

অথচ যন্ত্রটাকে একবার দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। একদিন আমি গাড়ি করে প্লেস দ্য গ্রীভ-এর উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন বেলা প্রায় এগারোটা। হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেল।

ময়দানে তখন অনেক মানুষের জটলা। কৌতূহলবশত জানালা দিয়ে আমি মাথা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। একদল লোককে লা গ্রীভ-এ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। আর ছেলে মেয়ে বাচ্চা বুড়ো সবাই বুকসমান উঁচু পাঁচিলে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। ওদের মাথার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল যে তিনজন লোক একটা লালচে রঙের কাঠের মঞ্চ তৈরি করছে।

BanglaBook.org

সেইদিন একটা লোককে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই ওরা মঞ্চটা তৈরি করছিল। পুরো দৃশ্যটা দেখার আগেই আমি ভয়ে আমার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। আমার গাড়িটার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রমহিলা তার বাচ্চাছেলেকে বলছিলেন—'কী হলো, দেখ্ দেখ্। ব্লেডটা ঠিকমতো নেমে আসছে না বলে ওরা মোম ঘষে ব্লেডের চ্যানেলটাকে কেমন মসৃণ করছে দেখ।'

আজকেও হয়তো ওই জায়গাটাই তাদের গন্তব্যস্থল। এখন ঘড়িতে ঠিক এগারোটা। ব্লেডের চ্যানেলে ওরা হয়তো এইবার মোম ঘষবে।

কিন্তু হতভাগ্য অপরাধী, এইবার তো তুমি আর তোমার মাথাটা ঘুরিয়ে নিতে পারবে না!

২৯.

ক্ষমা! ক্ষমা! আচ্ছা ওরা আমাকে ক্ষমা করতেও তো পারে—কে জানে! রাজামশাই তো আমার ওপর বিরূপ নন। অতএব আমার উকিলকে ডেকে পাঠানো হোক। খুব তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ, আমার উকিল কোথায়? এখন আমি যুদ্ধ-জাহাজে দাঁড় টানতেও রাজি। আমার ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের কঠিন শ্রমই যথেষ্ট হওয়া উচিত; অথবা কুড়ি বছরের; অথবা গরম-লোহার শিক দিয়ে দিক্ না দেগে; অথবা আরো শাস্তি দিতে চাইলে সারা জীবনের দ্বীপান্তর। আমি আজ সবকিছুতে রাজি। শুধু বিনিময়ে তোমরা আমায় বাঁচতে দাও। দ্বীপান্তরে কয়েদীদের অন্তত হেঁটে চলে বেড়াবার স্বাধীনতা তো আছে। ওরা সূর্য তো অন্তত দেখতে পায়!

BanglaBook.org

৩০.

ফাদার ফিরে এলেন।

ওঁর চুলগুলো সাদা, ব্যবহার বিনম্র। উনি এক সুন্দর ও সততাসুলভ মুখের অধিকারী। সত্যি বলতে কি উনি নিশ্চিতভাবেই এক সুন্দর ও সহানুভূতিশীল মানুষ। আজ সকালেই আমি দেখেছি ওঁকে ওঁর মানিব্যাগ থেকে সব টাকা পয়সা কয়েদীদের পাতা হাতে উজার করে দিতে। কিন্তু তাহলে কেন ওঁর কণ্ঠস্বর অমন উচ্ছ্বাসহীন? কেন তাহলে উনি কাউকে উদ্বুদ্ধ করতে অক্ষম? কেন তাহলে উনি এতক্ষণ যাবৎ এমন কোনো কথা বলতে পারেন নি যা আমার যুক্তিকে নাড়া দিতে পারে অথবা আমার হৃদয়?

আজ সকালে আমি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। উনি আমাকে যে কি বলছিলেন তা প্রায় শুনতেই পাইনি। না শুনেও ওঁর কথাগুলো আমার নিরর্থক মনে হয়েছিল এবং আমাকে আরো উদাসীন করে দিয়েছিল। এখন যেমন জানালার কাঁচে বৃষ্টি পড়ছে তেমনি তখন ওঁর কথাগুলোও ঠান্ডা বৃষ্টির ফোঁটার মতো ঝরে পড়েছিল।

তবু এই মুহূর্তে যখন উনি আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য ফিরে এলেন তখন ওঁকে দেখে আমি ভীষণ আনন্দিত হলাম। আমার মনে হলো এই এতো লোকের মাঝখানে উনিই একমাত্র এখনো আমার কাছে মানুষের মতো মানুষ, হঠাৎই আমি ওঁর মুখ থেকে ভালো ভালো কথা শোনার ও সমবেদনার প্রত্যাশায় তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলাম।

আমরা বসলাম, উনি একটা চেয়ারে আর আমি আমার বিছানায়। উনি কথা বলা শুরু করলেন—'জানো বাবা,... ওঁর এই আন্তরিক সম্বোধনটা আমাকে মুগ্ধ করলো। একটু থেমে উনি আবার বলতে লাগলেন—'আচ্ছা বাবা, তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো?'

'হ্যাঁ, ফাদার, রাখি'—আমার উত্তর।

'তুমি কি পবিত্র ক্যাথলিক রীতিনীতি আর রোমান চার্চে বিশ্বাসী?'

'আমার সমস্ত সত্বা দিয়ে'—আমি বললাম।

'কিন্তু বাবা,' তিনি বলতে থাকলেন, 'মনে হয় হয়তো তোমার দৃঢ় বিশ্বাসের কিছুটা অভাব আছে।'

এরপর তিনি ক্রমাগত বলতেই থাকলেন তিনি অনেক কিছু বললেন এবং যখন তাঁর মনে হলো যে তিনি অনেক কিছু বলেছেন তখনই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আর আমার দিকে পূর্ণ চোখে প্রথমবার তাকালেন। অর্থাৎ যখন থেকে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছিলেন। পরে শুধালেন—'ঠিক আছে?'

আমি প্রত্যয়ের সঙ্গে ওঁকে বললাম যে, আমি ওঁর সব কথা প্রথমে মন দিয়ে, পরে খুব মন দিয়ে এবং তারপর শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছি। তারপর আমিও উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—'কিন্তু বাবা, এবার যে আমি একটু একা থাকতে চাই, আমাকে ক্ষমা করবেন?'

উনি আমাকে তার উত্তরে জিজ্ঞেস করলেন—'আবার কখন আসবো?'

'আমি আপনাকে জানাবো।'

তারপর উনি মাথা নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেলেন। অবশ্য মোটেই রাগ করে নয়। তবে ওঁর মাথা নাড়া দেখে আমার মনে হলো যেন উনি আপন মনেই বুঝি-বা বলছিলেন—'একজন অখ্রিস্টান।'

না, যত নীচেই আমি নামি না কেন, কোনোদিনই আমি অখ্রিস্টান হতে পারবো না এবং স্বয়ং ঈশ্বরই আমার সাক্ষী যে আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী। তাহলে ওই বৃদ্ধ মানুষটি আমার উদ্দেশ্যে কী বললেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি বা অনুভব করতে পারিনি, ঘৃণা নয়, চোখের পানি নয়, উনি যে খুব একটা কষ্ট পেয়েছেন তাও মনে হয়নি, ওঁর হৃদয় থেকে কোনো অনুভূতিও আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়নি, উনি তো আমাকে কিছু দানও করেন নি। গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে অস্বচ্ছ মনে হলো। মনে হলো ওঁর ব্যবহার যে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে বাধা নেই। যেখানে গাম্ভীর্য প্রয়োজন সেখানে উনি অলঙ্কারের সাহায্য নিয়েছেন, যেখানে সরলতা প্রয়োজন সেখানে উনি ছিলেন গতানুগতিক এক কথায় উনার ধর্ম উপদেশ ছিল

BanglaBook.org

অত্যন্ত সাধারণ। যেন বলতে হয় বলে বলা মাত্র। মাঝে মধ্যে ল্যাটিনে সেন্ট অগাস্টিন অথবা সেন্ট গ্রেগরি-র থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে সেটাকে আকর্ষণীয় করে তোলার প্রচেষ্টা মাত্র। মোটকথা মনে হচ্ছিল তিনি এমন একটা পরিচ্ছেদের আবৃত্তি করছেন যা এর আগেও তিনি বহুবার করেছেন। তোতাপাখির মতো ভীষণ মুখস্ত একটা বিষয় তিনি আউরেই চলেছেন এবং স্মৃতি থেকে সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে মুছেও ফেলছেন। তাঁর চোখ কারো দিকে তাকায় নি, তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল পক্ষপাতশূন্য অথবা বলার সময় তাঁর হাতগুলো পর্যন্ত এতটুকু ওঠানামা করেনি।

তাহলে ওনাকে আমার অন্যরকম কেন মনে হতে পারে? উনি তো এই জেলেরই সরকারি যাজক। ওঁর কাজ তো শুধু সান্ত্বনা দেওয়া আর অনুশোচনা করানো। আর ওই কাজ করেই তো উনি ওঁর জীবিকা অর্জন করেন। উনি ওঁর বাকপটুতা অকাতরে দান করেন অপরাধী ও দণ্ডিতদের কাছে। ওদের যে তিনি সঙ্গদান করেন এটা স্বীকারও উনি করেন কারণ ওটাই তো ওঁর কাজ। মানুষকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিতে দিতেই তো উনি বুড়ো হয়ে গেলেন। অন্যদের কাছে যা ভয়ানক, ওঁর কাছে সেগুলো অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। ওঁর সাদা চুল কোনো অবস্থাতেই আর ভয়ে খাড়া হয়ে ওঠে না, নরহত্যার জন্য মঞ্চ তৈরির সমস্ত ভয়ংকর কর্মকাণ্ড তাঁর কাছে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সবকিছুতেই আজ তিনি অনাসক্ত। এ কথাটাও সত্যি যে উনি তাঁর নোট বইয়ের একটা পাতা অপরাধীদের জন্যে ও আরেকটা পাতা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের জন্যে লিখে ভরিয়েছেন। একদিন আগে ওঁকে জানানো হয় যে পরদিন অমুক সময়ে ওঁকে একজনের কাছে গিয়ে যাজকতা করতে হবে। উনি তখন জিজ্ঞেস করেন যে সেই ব্যক্তি কি শুধু অপরাধী নাকি গিলোটিনের শিকার। সব শুনে টুনে উনি নির্দিষ্ট পাতাটির ওপর চোখ বুলিয়ে লোকটির কাছে আসেন।

তাহলে ব্যাপারটা এরকমই দাঁড়াচ্ছে যে যারা তৌলু-তে যাবে আর যারা লা গ্রীভ-এ যাবে ওঁর কাছে এই দু-দল মানুষের মধ্যে কোনো প্রভেদই নেই। আবার একইরকমভাবে এই দু-দল মানুষের কাছেও তিনি সাধারণ একজন লোক ব্যতীত অন্য কেউ না।

ওফ্! এর বদলে তাড়াতাড়ি গিয়ে, নিয়ে এসো গ্রামের এক যাজকের তরতাজা তরুণ প্রতিনিধিকে অথবা যাজক পাড়া থেকে কোনো এক বৃদ্ধ যাজককেই। যাও গিয়ে দেখো, হয়তো উনি আগুন পোহাতে পোহাতে প্রার্থনার বই পড়ছেন এই আশা নিয়ে যে কেউ তাঁকে বিরক্ত করবে না। তাঁকে গিয়ে বলো যে একজন মানুষকে এখনই হত্যা করা হবে। এমতাবস্থায় আপনিই একমাত্র লোক যে তাকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে পারে। যখন তার হাতদুটো বেঁধে দেওয়া হবে তখন তার পাশে আপনাকে থাকতেই হবে। তার মাথা ন্যাড়া করা হয়ে গেলে গাড়িতে তার সঙ্গে আপনাকেও উঠতে হবে। ক্রুশে নিহত যিশুর প্রতিমূর্তি আপনাকে তুলে ধরতে হবে ঘাতক আর মৃত্যুপথযাত্রী সেই মানুষটির মাঝখানে। লা গ্রীভ-এ যাওয়ার সময় পাথুরে রাস্তায় তার সঙ্গে আপনাকেও ঝাঁকুনি খেতে খেতে যেতে হবে। আপনাকেও

BanglaBook.org

তার সঙ্গে ভয়ংকর, রক্তপিপাসু জনতার মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোতে হবে। মঞ্চে ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তটিতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে হবে আর ধীর, অচঞ্চলভাবে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না গিলোটিনের ধারালো তিনকোনা ইস্পাতের ব্লেড তার ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে দেয়।

সেইজন্যে পা থেকে মাথা অবধি কাঁপতে থাকা মানুষটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো আমি যাঁর বুকের উত্তাপ পেতে চাই। আর চাই তাঁর চরণতলে নত হতে। তিনি আমার দুঃখে কাঁদবেন। সঙ্গে আমিও কাঁদবো। তাঁর মুখনিসৃত বাণীর মধ্যে আমি সান্ত্বনা খুঁজে পাবো। আমার হৃদয় তাঁর হৃদয়ে মিশে যাবে। তিনি আমার আত্মাকে গ্রহণ করবেন আর আমি গ্রহণ করবো তাঁর ঈশ্বরকে।

কিন্তু এই দয়ালু বৃদ্ধ ভালোমানুষটি আমার কে? আর আমিই বা তাঁর কে? হাজার ভাগ্যাহতদের মধ্যে একজন বই তো নয়? অনেক ছায়ার মধ্যে এক ছায়া মাত্র যাদের হারিয়ে যেতে তিনি বহুবার দেখেছেন। বহুর মধ্যে আরো একটা সংখ্যামাত্র যাদের তিনি বহুদিন হত হতে দেখেছেন।

কিন্তু ওঁকে এইভাবে উড়িয়ে দেওয়াটাও বোধহয় আমার অন্যায় হচ্ছে। কারণ উনি সত্যিই একজন সৎ ও মহৎ মানুষ আর আমি হচ্ছি এক মন্দ লোক। সবই আমার বরাত! যদিও মন্দ মানুষ হওয়ার জন্যে আমি সম্পূর্ণ দায়ী নই, তবু আমার নিশ্বাস প্রশ্বাসে এখন রক্তের গন্ধ যা আশেপাশের সব কিছুকেই ম্লান করে তুলছে।

ওরা একটু আগে আমার জন্যে কিছু খাবার এনেছে, হয়তো এই ভেবে যে আমি একটু আধটু খেলেও খেতে পারি। খুব সুন্দর রান্না এবং অত্যন্ত ভালোভাবে পরিবেশিত। প্রিপারেশনটা মনে হচ্ছে মুরগির। সঙ্গে আরো কিছু। আমি খাওয়ার চেষ্টা করলাম খুব। কিন্তু প্রথম গ্রাসটাই আমার পক্ষে গেলা সম্ভব হলো না। সবকিছু এত তেঁতো, এত বিস্বাদ মনে হলো!

BanglaBook.org

৩১.

টুপি পরা এক ভদ্রলোক আমার ঘরে ঢুকে আমার দিকে প্রায় কোনো ভ্রুক্ষেপ না করেই একটা কাঠের স্কেল বার করে দেওয়ালের পাথরগুলোকে লম্বালম্বি মাপতে শুরু করলেন আর আপন মনেই জোরে জোরে বলতে থাকলেন—বাহ্ বেশ ভালো, না এটা তো হতে পারে না।'

কারারক্ষীকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ভদ্রলোকটি কে। সাধারণভাবে দেখলে মনে হবে যে ভদ্রলোকটি জেল কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত কোনো আর্কিটেক্টের সহকারী। হঠাৎই ভদ্রলোক আমার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠে যে কারারক্ষীর সঙ্গে তিনি এসেছিলেন তার সঙ্গে কিছু কথা চালাচালি করলেন। তারপর উদাসীনভাবে আমার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন আর আপন মনে বক বক করতে করতে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কাজ শেষ হলে ভদ্রলোকটি আমার কাছে এসে বাজখাঁই গলায় বলে উঠলেন—'দোস্ত, আর মাত্র ছ'মাসের মধ্যে, বলে গেলাম, এই জেলের অনেক উন্নতি হবে, মিলিয়ে নেবেন।' হয়তো এই কথা বলার সময় তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন—'দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো এই যে তাতে তোমার কোনো উপকার হবে না যদিও।'

ওঁর মুখটা এরপর এমন হাসি হাসি হয়ে উঠলো যে আমার মনে হলো বিয়ের রাতে একটা কনের সঙ্গে যেমন ঠাট্টা ইয়ার্কি করা হয় তেমনি বোধহয়, সব জেনে শুনেও উনি আমার সঙ্গে কদর্য ইঙ্গিতপূর্ণ মজা মারতে শুরু করবেন।

উচ্চপদস্থ কারারক্ষীটি আমার মুখ থেকে যেন উত্তরটা ছিনিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন—'মশাই, একটু আস্তে কথা বলুন আর মৃত্যুর প্রতি একটু শ্রদ্ধা বজায় রাখার চেষ্টা করুন।'

অবশেষে সেই আর্কিটেক্ট চলে গেলেন। আর আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম যে পাথরগুলো উনি মাপামাপি করছিলেন তাদেরই একটার মতো।

৩২.

এরপর একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটেছিল।

আমার সহমর্মী কারারক্ষীর ছুটি হয়ে গেলে সে চলে গেল। অথচ একজন অকৃতজ্ঞ নচ্ছারের মতো আমি তাকে ধন্যবাদটুকুও জানালাম না। ওর বদলে অন্য এক কারারক্ষী আমার পাহারায় এলো। এই লোকটার বেশ ভালোই টাক পড়তে শুরু করেছে। ওর গরুর মতো বড় বড় চোখে শূন্য দৃষ্টি।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে লোকটাকে আমি খুব মন দিয়ে দেখেছি। দরজার দিকে পেছন ফিরে আমি টেবিলের কাছে বসেছিলাম আর ভুরুর ওপর আলতো করে হাত বোলাতে বোলাতে মাথাটা ঠান্ডা করার চেষ্টা করছিলাম। কারণ নানান দুশ্চিন্তায় আমি আমার মনের ঠিকানাটাই পাচ্ছিলাম না।

হঠাৎ কাঁধে একটা আলতো ছোঁয়া অনুভব করে আমি ঘুরে তাকালাম। লোকটা সেই বদলী-রক্ষী যার তত্ত্বাবধানে আমি আপাতত আছি।

মোটামুটি এরকমভাবেই সে আমার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলো।

'আচ্ছা কয়েদী, তুমি কি একজন ভালো মানুষ?'

'না'—আমার উত্তর।

আমার চটজলদি এমনতর উত্তরে সে বোধহয় খানিকটা থমকে গেল। তবু একটু ইতস্তত করে সে বললো—'মজা করার জন্যে তো কেউ আর বদমাশ হয় না।'

'কেন নয়'—আমার জবাব। 'তোমার যদি আর কিছু বলার না থাকে তাহলে আমাকে একটু একা থাকতে দাও। অথবা কিছু বলার থাকলে তাড়াতাড়ি বলে ফেলো।'

BanglaBook.org

'কয়েদী, তুমি প্লিজ কিছু মনে করো না'—সে বললো—'ক'টা কথা বলি। নিজের কোনো ক্ষতি না করে যদি কোনো হতভাগ্যের মনে একটু খুশির ছোঁয়া দিতে পারো, তাতে কি তুমি গররাজী?'

কাঁধ ফাঁদ ঝাঁকিয়ে বেশ বিরক্তি নিয়েই আমি বললাম—'তোমার কি মাথা টাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? কোনো কারো সুখের উৎস টুৎস হওয়ার ব্যাপারটা আর আপাতত আমার কব্জায় নেই। সুতরাং কী করে আমি অন্য কাউকে খুশি করতে পারি?'

তার হাবাগোবা চেহারার সঙ্গে মোটেই মানানসই নয় এমনই এক দুর্জ্ঞেয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটা তার গলার স্বর বেশ নিচু করেই বললো—'হ্যাঁ বন্দিভাই হ্যাঁ, তুমিই খুশি করতে পারবে, অপরের জন্যে সুখ আনতে পারবে এবং সৌভাগ্যও এনে দিতে পারবে। আর সেইসব সুখ সমৃদ্ধি আসবে তোমার কাছ থেকে আমার কাছে। কেমন করে আসবে? তাহলে বলি শোন। আমি একজন খুবই গরিব কনস্টেবল। খাটনি আমার যতটাই বেশি, মাইনে ততটাই কম। শুধু ঘোড়াটার দেখভালের পেছনেই আমার বহু টাকা চলে যায়। অতএব সবদিক সামাল দেওয়ার জন্যে জুয়াটা আমাকে খেলতেই হয়। বুঝতেই পারো সামাল না দিয়ে তো পার পাওয়ার জো নেই! জুয়া খেলতে খেলতে বহুবারই আমি জেতার খুব কাছাকাছি এসেছি। কিন্তু জেতার জন্যে যেটা মোক্ষম অস্ত্র তা হলো একটা সুন্দর সংখ্যা বাছাই করা। আমি বড়, ছোট, উপরে, নিচে সবরকমভাবেই চেষ্টা করে দেখেছি। কিন্তু বরাত মন্দ বলে ভালো সংখ্যার জোড় লাগাতে পারিনি। এই ধরো, আমি খেললাম ৭৬ নম্বরটা, শা দেখলাম লেগেছে ৭৭ নম্বর। আমি একই নম্বরের পেছনে বহুদিন আঠার মতো লেগে থেকেও দেখেছি। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। একটু ধৈর্যটা রাখো ভাই আমি কিন্তু আসল কথাটার দিকেই এগোচ্ছি। মানে বলতে চাই যে, কয়েদীভাই তুমিই তো আমার হয়ে জয়ী হতে পারো। এইভাবে কথাটা বলার জন্যে তুমি আমার অপরাধ নিও না। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে যে আজই নাকি তোমার পালা। একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে নিহত মানুষের আত্মা তো সবই আগেভাগে জানতে পারে, বুঝতে পারে ও দেখতেও পায়। অতএব কোন নম্বরগুলো আগামিকালের খেলায় লাগতে চলেছে সেগুলো জানা এবং আমাকে জানানো তোমার কাছেও কোনো সমস্যা হবে এমনটা আমি স্বপ্নেও ভাবি না। সুতরাং তোমাকে যদি আমি অনুরোধ করি যে আগামিকাল সন্ধ্যায় তিনটি সংখ্যা জেনে, মানে সবচেয়ে ভালো সংখ্যাগুলো জেনে, এখানে যদি একবার ফিরে আসো, তাহলে কি তুমি কিছু মনে করবে? আমি জানি যে তুমি কিছুই মনে করবে না। আর আমার কথা ভেবে একদম যেন পিছিয়ে যেও না। কারণ ভূতের ভয় টয় আমার একদমই নেই। আমার ঠিকানাটা বলছি:

পপিনকোর্ট ব্যারাকস
স্ট্যায়ারওয়ে-এ, রুম নং-২৬

জায়গাটা হচ্ছে করিডরের একদম শেষ প্রান্তে। আমার মুখটা নিশ্চয়ই তোমার মনে থাকবে—তাই না? অবশ্য, তুমি যদি আজ সন্ধ্যাতেও আসতে চাও তাহলে তাও আসতে পারো।

BanglaBook.org

এক অলীক আশার বিদুৎ যদি না আমার মনে ঝিলিক হেনে যেতো তাহলে হয়তো আমি এই ভাঁড়টার কথার কোনো জবাবই দিতাম না। আমার বর্তমান অবস্থা এমনই মরিয়া যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে একটা চুল দিয়েও আমি একটা মোটা লোহার শেকল এখন দু-টুকরো করতে পারি।

'শোনো'—আমি ওকে বললাম—একটা লোক যে খুব তাড়াতাড়ি মরতে চলেছে যতটা সম্ভব তার মতো কণ্ঠস্বর করে—'আসল ব্যাপার হচ্ছে আমি চাইলে তোমাকে রাজার চেয়েও ধনী করে দিতে পারি, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা তোমাকে জিতিয়ে দিতে পারি। তবে একটা শর্ত আছে।'

ওর চোখ উত্তেজনায় ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল—'কী শর্ত? কী সেটা? কয়েদীভাই তুমি যা বলবে তাতেই আমি রাজি।'

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি তোমাকে তিনটি নয় চারটে সংখ্যার হদিস দেবো যদি তুমি আমার সঙ্গে পোশাক পরিবর্তন করো।'

'ব্যস, মাত্র এইটুকু?' তার পোশাকের হুকগুলো খুলতে খুলতে সে প্রচণ্ড উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলো।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওর প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। আমার বুকটাও প্রচণ্ড রকম অস্বস্তি ও উত্তেজনায় ধুকপুক করছিল। আমি যেন মানসচোখে দেখতে পেলাম পোশাক পরা এক রক্ষীর জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো। তারপর চত্বরের দরজা, আর তারও পর রাস্তা। প্যালাইস দ্য জাষ্টিস তখন আমার অনেক পিছনে!

কিন্তু ঠিক সেই সময় হঠাৎই সে হতচকিত হয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো—'তুমি এই কাজটা আমাকে করতে বলছো নিশ্চয়ই পালাবার জন্যে নয়?'

আমি বুঝলাম যে, নাহ্ আর কোনো আশা নেই। তবু আমি সম্পূর্ণ নিষ্ফল জেনেও পাগলের মতো একবার শেষ চেষ্টা করলাম। ওকে বললাম—'নিশ্চয়ই, কিন্তু বদলে যে তুমি বিশাল সৌভাগ্যের অধিকারী হবে?'

সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো—'পাগল নাকি! তাহলে আমার সংখ্যাগুলোর কী হবে? সংখ্যাগুলো ঠিকঠাক হতে গেলে তোমার যে মরাটাই দরকার!'

আমি হতাশভাবে মাটিতে বসে পড়লাম। আমার সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাওয়া আশার নিচে আবার নতুন করে পিষে গিয়ে আমি ভীষণ নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম।

৩৩.

আমার বন্ধ চোখের ওপর হাত রেখে আমি বর্তমানকে অতীতের গর্ভে সমাধিস্থ করতে চাইলাম। যখন আমি দিবাস্বপ্ন দেখি তখন আমার শৈশব, আমার যৌবন ফিরে ফিরে আসে। আহ্, সেইসব ফেলে আসা দিনগুলো কত শান্ত, কত মধুরই না ছিল। অপার খুশিতে ভরা। আমার মাথার মধ্যে এলোমেলো ভীতিকর

BanglaBook.org

ভাবনার অন্ধ গভীরতার ওপর ওরা যেন মৌসুমী ফুলে ভরা দ্বীপের মতো ভেসে থাকে।

কত সহজেই না আমার শৈশব আরো একবার ফিরে আসে। একটা সরল হাসিখুশি স্কুলের ছেলে যে তার ভাইদের সঙ্গে দৌড়াচ্ছে, খেলছে, চিৎকার চ্যাঁচামেচি করছে সবুজ বাগানের বুক চিরে ধেয়ে যাওয়া পথে পথে। ওখানেই ওর প্রথম বছরটা কেটেছিল। সেটা ছিল একটা কনভেন্টের বাগান যার ভারী ছাদ তাকিয়ে থাকতো নিচে ভ্যাল দ্য গ্রেস-এর অন্ধকার গম্বুজের দিকে।

এর পরের চারটে বছর বাদ দিয়ে আবার নিজেকে দেখতে পেলাম। তখনো বলতে গেলে আমি শিশুই। কিন্তু ওইটুকু বয়স থেকেই আমি স্বপ্ন দেখা শুরু করেছি, ভাসতে শিখেছি আবেগে। সেই নির্জন বাগানে আমি ছাড়া একটা মেয়েও ছিল।

এই স্প্যানিশ মেয়েটির ছিল হরিণীর মতো ডাগর চোখ, লম্বা বাদামি চুল, সোনার মতো রঙ, গোলাপ পাপড়ির মতো ঠোঁট আর গাল। চৌদ্দ বছরের পেপা এসেছিল আন্দালুসিয়া থেকে।

আমাদের মায়েরা বাগানে আমাদের ছুটাছুটি করতে বললেও আমরা শুধুই হেঁটেছিলাম।

আমাদের খেলতে বলা হলেও যেহেতু আমরা প্রায় সমবয়সী ও বিপরীত লিঙ্গের ছিলাম তাই আমরা গল্প করাটাকেই বেছে নিয়েছিলাম।

মাত্র বছরখানেক আগে যদিও আমরা একসঙ্গে ছুটাছুটি করেছি, হোঁচট খেয়ে দু'জনে জড়াজড়ি করে পড়েছি, গাছের সবচেয়ে বড় আপেল নিয়ে পেপিতার[১৩] সঙ্গে ঝগড়া করেছি, একটা পাখির বাসার জন্যে ওর গায়ে হাত পর্যন্ত তুলেছি, আর ও কেঁদে উঠতে আমি ওকে বলেছি—'এটাই তোমার যোগ্য শাস্তি।' তারপর ভাব হয়ে গেলে আবার আমরা দৌড়াদৌড়ি করেছি। মায়েদের কাছে ফিরে যখন সেইসব গল্প বলেছি তখন ওরা বলতো ওইরকম বোকামো আর কখনো না করতে। কিন্তু মনের গোপনে ওরা নিশ্চয়ই ভেবেছিল যে আমরা বোধহয় ঠিকই করেছি।

এই মুহূর্তে ওর শরীরের ভার আমার হাতের উপর রাখা। নিজেকে ভীষণ গর্বিত ও উত্তেজিত লাগছে। আমরা খুব ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে খুব নিচু স্বরে কথা বলছিলাম। ওর রুমালটা পড়ে যেতে আমি সেটা তুলে দিলাম। একে অপরের স্পর্শ পেয়ে আমাদের হাতগুলো কেঁপে উঠলো। ও আমাকে বলতে থাকলো ছোট ছোট পাখিদের কথা, বহু বহু দূরে মিটমিট করে জ্বলতে থাকা আকাশের তারাদের গল্প, গাছের আড়ালে গোলাপি সূর্যোদয়ের কথা, অথবা বোধহয় তার বোর্ডিং স্কুলের বন্ধুদের কথা, তার পোশাক ও রিবণের বিবরণ। আমাদের নির্দোষ কথাবার্তায় এক এক সময় আমরা নিজেরাই লজ্জিত হয়ে পড়তাম। কিশোরীটি কখন যেন এক যুবতী নারী হয়ে উঠেছে।

BanglaBook.org

সেদিন সন্ধ্যায়—সেটা ছিল এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যা—আমরা সেই সবুজ বাগানে বাদাম গাছের নিচে বসে ছিলাম। আমাদের হাঁটার মাঝে যতি চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল একটা অনেকক্ষণের নীরবতা। হঠাৎই ও আমার হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—'চলো দৌড়াই!'

আমি ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম। ওর ঠাকুমা মারা গিয়েছিল বলে শোকপালনের চিহ্ন হিসাবে ও কালো পোশাক পরে ছিল। অকস্মাৎ যেন পেপা পেপিতা-তে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আর ওর মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। বললো—'বাজি, চলো দেখি দৌড়ে কে জেতে!'

আমার সামনে দিয়ে ও বিদ্যুৎরেখার মতো দৌড় শুরু করলো। ওর মৌমাছির মতো ছিপছিপে সরু কোমর আর ছোট্ট ছোট্ট পা গুলোর আন্দোলন ওর পোশাকটাকে পায়ের ডিম অবধি তুলে তুলে দিচ্ছিল। আমিও ওর পেছনে দৌড় শুরু করলাম। ও আরো জোরে দৌড়াতে থাকলো। বাতাস কেটে তীরের মতো ছুটে যাওয়ার সময় ওর জামার পেছনের অংশটা নিয়মিত ছন্দে অনেকটা করে উঠে যাচ্ছিল আর আমি ওর নরম, মসৃণ সোনা রঙের পিঠটা দেখতে দেখতে ছুটছিলাম।

ওই দৃশ্য স্বভাবতই আমাকে প্রচণ্ড উত্তেজিত করে তুললো। ভাঙা চোরা পুরনো ইঁদারাটার কাছে পৌঁছবার আগেই আমি ওর বেল্টটা ধরে ফেললাম। এর মানে হলো আমি জিতে গেছি। কুয়োর ধারে সবুজ ঘাসের ওপর ওকে ধরে বসালাম। ও কোনো বাধা দিল না। ভীষণ হাঁপাচ্ছিল আর হাসছিল ও। আমার অবস্থা কিন্তু তখন ঠিক উল্টোটা। আমি ওর গভীর দিঘির মতো কালো চোখের গহনে ক্রমশই ডুবে যাচ্ছিলাম।

'বসো না পাশে'—ও বললো—'দেখ এখনো আলো আছে। এসো না কিছু পড়ি, তোমার কাছে কি কোনো বই আছে?'

ভয়েজেস অব স্প্যালাঞ্জানি[১৪] বইটির দ্বিতীয় খণ্ডটি আমার কাছে ছিল। ওর খুব কাছে ঘন হয়ে বসে আমি বইটা খুললাম। ও আমার কাঁধে নিজের কাঁধটা ঠেকিয়ে দিতেই আমরা আপনমনে দু'জনে একই পাতা পড়তে শুরু করলাম। পাতা ওল্টাবার আগে সবসময়েই ওকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে হতো। আমার মাথাটা যে ওর মতো অত পরিষ্কার ছিল না।

'তোমার হয়েছে?' ও আমায় প্রশ্ন করলো যখন আমি সবে শুরুটুকুই পড়তে পেরেছি কি পারিনি।

এরই মধ্যে আমাদের মাথা দুটো একে অপরকে ছুঁয়ে রইলো। আমাদের চুলগুলোর আলাদা সত্তা বলতে কিছু রইলো না আর। আমাদের মুখ দুটো একে অপরের খুব কাছাকাছি এসে থমকে রইলো। ঘন হয়ে উঠলো আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস। তারপর কখন যেন আমাদের মুখ দুটো একে অপরের মধ্যে মিশে এক হয়ে গেল।

BanglaBook.org

অনেক পরে আমরা যখন আবার বইটা পড়ার চেষ্টা করলাম তখন সারা আকাশটা নক্ষত্রের আলোয় আলোকিত।

'মা মা জানো তো'—ও ফিরে গিয়ে বললো—'আমরা এত্তো এতোদূর অবধি ছুটে গিয়েছিলাম সে তুমি চিন্তাই করতে পারবে না!'

কিন্তু আমি একদম চুপ।

'কি ব্যাপার চুপ করে আছিস যে বড়'—মা বললেন—'তোকে অমন দুঃখী দুঃখী লাগছে কেন?'

অথচ মা জানতেই পারলো না যে আমার মনটা তখন ছিল স্বর্গে।

সেই সন্ধ্যার কথাটা আমি সারা জীবন মনে রাখবো। সারা জীবন!

৩৪.

ঘড়িটায় বোধহয় কিছু একটা ঘণ্টা টণ্টা বাজলো। কারণ আমি শুধু বাজার আওয়াজই পেলাম। ক'টা বাজলো সেটা শুনতে পেলাম না। আমার কানের মধ্যে মনে হচ্ছে যেন একটা পিয়ানো ক্রমাগত বেজেই চলেছে সেগুলো কি আমার শেষ চিন্তাভাবনাগুলোর আওয়াজ?

যখনই এইসব স্মৃতিগুলোর মাঝে আমি শেষ আশ্রয়টুকু খুঁজে পেতে চাই তখনই আমার অপরাধের ছায়াটা দীর্ঘায়িত হয়ে ওঠে। আমার কৃত অপরাধের জন্য আমি আরো দুঃখিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করি। আমার শাস্তি হওয়ার আগে অবশ্য আমি আরো বেশি বিমর্ষ ছিলাম। অপরাধটা করার পর থেকেই আমার মনে মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কোনো চিন্তাই ঠাঁই পায়নি। তবু আমি যে সকলকে দেখাতেও চাই যে আমার কৃতকর্মের জন্য আমি ভীষণভাবে অনুতপ্ত।

যখন আমি আমার অতীত জীবনের কথা চিন্তা করি আর তারপর যখন ভাবি যে একটি কুঠারের আঘাত খুব শীঘ্রই আমার জীবনে যতি চিহ্ন এঁকে দেবে, তখনই সেই অভাবনীয়তার কথা ভেবে আমি শিউরে উঠি। অথচ কি মধুর আমার সেই ছেলেবেলা। আমার সুন্দর যৌবন! ওরা যেন সোনা রঙে বোনা একটা চাদর যাতে কারুকাজ করা হয়েছে লাল রঙের পাড় দিয়ে। সেই অতীত আর বর্তমানের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা রক্তের নদী। আগের আমি আর বর্তমানের এই অপরাধীটার মাঝখান দিয়ে।

যদি কোনোদিন আমার গল্প পড়া হয় তাহলে সত্যিই এটা অবিশ্বাস্য মনে হবে যে কীভাবে আমার এতগুলো নির্দোষ বছরকে হায়েনার মতো অনুসরণ করে এসেছে এই একটি ঘৃণার্হ বছর যার শুরু হয়েছে অপরাধ দিয়ে আর শেষ হতে চলেছে শাস্তির মাধ্যমে। এই ঘটনা পরম্পরাকে তাই আর যাই হোক শ্রদ্ধা করা যাবে না।

কিন্তু তবু ওই অন্তঃসারশূন্য আইন আর অন্তঃসারশূন্য মানুষগুলোর উদ্দেশ্যে আমার একটাই স্বীকারোক্তি যে না আমি সত্যিই পাপী নই!

BanglaBook.org

ওফ্, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপরই আমাকে চলে যেতে হবে। তবু ভাবতে ইচ্ছে হয়, ভালো লাগে ভাবতে যে ঠিক এক বছর আগে হয়তো এমনিই এক দিনে আমি ছিলাম নিরপরাধ ও স্বাধীন। সেইসব দিনগুলোতে গাছের নিচ দিয়ে যেতে যেতে পা দিয়ে আমি শীতের ঝরা পাতা ওড়াতাম।

৩৫.

ঠিক এই মুহূর্তে প্যালাইস ও লা গ্রীভ-এর চারপাশের সব বাড়িগুলোতে এবং গোটা প্যারিসে লোকজনেরা চলাফেরা করছে স্বাধীনভাবে, কথা বলছে হাসছে, খবরের কাগজ পড়ছে, চিন্তা করছে ব্যবসার কথা, দোকানিরা বিক্রি বাটা করছে, যুবতী নারীরা আগামী সন্ধ্যায় নাচের কথা ভেবে ঠিকঠাক পছন্দ করে রাখছে তাদের পোশাক, আর মায়েরা হয়তো তাদের বাচ্চাগুলোর সঙ্গে খুনসুটি করছে।

৩৬.

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় একদিন কেমন নটরডেম-এর বিশালাকৃতি ঘণ্টা দেখতে গিয়েছিলাম।

অন্ধকার ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে আর দুটো টাওয়ারের মধ্যের সরু পথটা পেরোতে পেরোতে আমার তখনই মাথা ঘুরছিল। আর যখন আমি সেই কাঠ আর পাথরের তৈরি খাঁচায় ঢুকলাম, যেখানে ঝুলছিল সেই আধটন ওজনের বিশাল ঘণ্টাটা, তখন প্যারিস আমার পায়ের অনেক নিচে শুয়ে ছিল।

আমি নিঃশব্দে আলতো পায়ে এবড়ো-খেবড়ো তক্তাগুলোর ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে খুব কাছ থেকে ঘণ্টাটার দিকে তাকিয়েছিলাম যাকে ঘিরে প্যারিস-এর আবালবৃদ্ধবণিতার এত শ্রদ্ধা। ঢালু পাথরের চাঁদোয়া যেটা ঘণ্টাঘরটাকে ঘিরে ছিল সেটা আমার পায়ের কাছ থেকে সোজা অনেক নিচে নেমে গেছে দেখেও আমি ভয় পাইনি। ফাঁক ফোকড় দিয়ে অনেক নিচে ক্যাথিড্রাল স্কোয়ারটাকেও দেখতে পেয়েছিলাম যেখানে মানুষগুলোকে লাগছিল ঠিক পিঁপড়ের মতো।

হঠাৎ সেই বিশালাকৃতি ঘণ্টাটা বেজে উঠতেই তার গম্ভীর প্রতিধ্বনি বাতাস ফালা ফালা করে ছুটে গিয়েছিল। ঘণ্টাটার গুরুগম্ভীর আওয়াজে সেই বিশাল টাওয়ার কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। মেঝেগুলো যেন কড়িকাঠের ওপর ধাক্কা দিচ্ছিল। সেই কান ফাটানো আওয়াজ আমাকেও প্রায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল আর কি! ঢালু পাথরের চাঁদোয়ার ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে যেতে গিয়েও কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। দারুণ ভয়ে মেঝের তক্তার ওপর শুয়ে পড়ে দু-হাতে সমস্ত শক্তি দিয়ে ধরে রেখেছিলাম সেই তক্তা। সেই ভীষণ ঘণ্টাধ্বনি আমাকে স্তব্ধ ও প্রায় বধির করে তুলছিল। আমার নিঃশ্বাস আটকে আসছিল আর আমার

BanglaBook.org

চোখদুটো তখন সেই বিশাল উচ্চতার ঢাল পথ বেয়ে নেমে অনেক নিচের স্কোয়ারের দিকে তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টে। মানুষগুলো ওখানে কত নিশ্চিন্ততায় যে চলাফেরা করছে!

ব্যাপারটা তো তাহলে একই! এই মুহূর্তেও মনে হচ্ছে বুঝিবা আমি সেই ঘণ্টাঘরের চূড়াতেই ঝুলে আছি। সেই একইরকম আতঙ্কিত ও হতবুদ্ধি হয়ে। আমার মাথা যখন আর কাজ করে না তখনই আমি একটা বিশাল ধণ্টাধ্বনি শুনতে পাই। চারপাশে তাকিয়ে আমি ভাবতে থাকি আমার সেই ফেলে আসা নিরুদ্বিগ্ন শান্ত অতীত জীবনের কথা। সেই রকম জীবনে আজও হাজার মানুষ স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে যে জীবন আমার এই গিলে খেতে আসা বিশাল শূন্যতা থেকে বহু বহু দূরে।

৩৭.

ওতেল দ্য ভিল-এর বাড়িটা মোটেই নয়নাভিরাম নয়।

এই বাড়িটার ছাদটা ভীষণ ঢালু, রোকোকো স্টাইলের চূড়া, বিশাল একটা সাদা ঘড়িঘর, প্রতিটি তলায় থামের কারুকাজ, হাজারখানেক জানালা, পায়ে পায়ে ক্ষয়ে যাওয়া সিঁড়ি, আর ডাইনে বাঁয়ে দুটো খিলানসহ বাড়িটা লা গ্রীভ-এর সমান উচ্চতায় দাঁড়িয়ে আছে। গোটা বাড়িটা অন্ধকারে মোড়া, বিষাদাচ্ছন্ন। বয়সের ক্ষতচিহ্ন সারা দেহে। আর ওটার রং এত কালো যে সূর্যের আলোও ওর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে।

হত্যার দিনে বাড়িটার প্রতিটি দরজা থেকে রক্ষীরা পিল পিল করে বেরিয়ে আসে, আর যারা বেরোয় না তারাও দণ্ডিত মানুষটাকে হাজার জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে। আর সন্ধ্যায় এর ঘড়িঘর, যেটা হত্যার নির্দিষ্ট সময় ঘোষণা করে, বাড়িটার প্রবেশপথের ওপর জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকে।

৩৮.

এখন একটা বেজে পনেরো।

আমার অনুভূতি বলতে বর্তমানে শুধু এইটুকুই

মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। পিঠটা ঠান্ডা বরফ আর কপালটা যেন পুড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। যখনই আমি উঠে দাঁড়াচ্ছি বা নিচু হচ্ছি তখনই মনে হচ্ছে মাথার মধ্যে একটা তরল পদার্থ নড়ে চড়ে বেড়াতে বেড়াতে ধাক্কা মারছে আমার মস্তিষ্কে ও মাথার খুলির দেওয়ালে দেওয়ালে।

ঘনীভূত সেই দ্রবণের আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত আমি পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাতে থাকলে প্রায়ই আমার হাত থেকে কলমটা ছিটকে পড়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

আমার চোখ এত জ্বালা জ্বালা করছে যেন মনে হচ্ছে চারপাশ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আমাকে ঘিরে ধরেছে।

আমার কনুই শিথিল হয়ে এসেছে।

আর মাত্র দু-ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তারপরেই আমার সব রোগ ভালো হয়ে যাবে।

৩৯.

ওরা বলে এতে ভাবনা চিন্তার কোনো কারণই নেই। কারণ তুমি তো কোনো ব্যথাই অনুভব করতে পারবে না। বরঞ্চ বলা যেতে পারে এই শাস্তি একরকম ক্ষমাসুলভ মুক্তি দান। এই শাস্তি মৃত্যুকে অনেক সহজভাবে এনে দেয়। যন্ত্রণা প্রায় বোঝাই যায় না।

তাই নাকি? তাহলে ছ'সপ্তাহের মৃত্যু যন্ত্রণাটা সহ্য করার ব্যাপারে কী বলার আছে? সারাদিন, সারারাত ধরে মৃত্যুর এই পদধ্বনি এগিয়ে আসার আওয়াজ? আর শেষ দিনটার সবক'টি মুহূর্তের এই যে মানসিক নির্যাতন যা ছুটে চলে ভীষণ আস্তে অথচ দুর্বার গতিতে? এই যে নির্যাতনের পারদ ধীরে ধীরে চড়তে চড়তে শেষ হয় হত্যামঞ্চে গিয়ে তার?

আপাতদৃষ্টিতে এগুলো হয়তো নির্যাতনই নয়।

বিন্দু বিন্দু সব রক্ত ঝরে পড়া অথবা ভয়ংকর চিন্তার পর চিন্তার আঘাতে আঘাতে বুদ্ধিবৃত্তির মৃত্যু—এ দুটোই কি একইরকম শেষ আক্ষেপ হিসাবে তুলনীয় নয়?

যাইহোক, বুঝি না ওরা কি করে ভাবতে পারে যে ব্যাপারটা একেবারেই বেদনাহীন! কে ওদের একথা বলেছে? কেউ কি দেখেছে যে কোনো একদিন একটা কাটা মাথা ঝুড়ির ওপর সোজা হয়ে উঠে চিৎকার করে সমবেত মানুষজনদের বলছে—'না, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি, কোনো বেদনাই অনুভব করতে পারিনি।'

অথবা ওদের দ্বারা নিহত কোনো ব্যক্তি কি কোনোদিন ফিরে এসে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছে—'ওফ্, দারুণ একটা আবিষ্কার করেছেন বটে। এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। মেশিনটার কাজ এক্কেবারে নিখুঁত।'

রোবসপীয়র কি কোনোদিন পেরেছে? অথবা ষোড়শ লুই?

কিন্তু না, কিছু না! এক মিনিটেরও কম, এক সেকেন্ডেরও কম। ব্যস্ কাজ শেষ। কিন্তু ওরা কি কোনোদিন নিজেদের অন্তত মনে মনেও ওই জায়গায় শুইয়ে সেই মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করেছে যখন গিলোটিনের পড়ন্ত ভারী ইস্পাতের ব্লেড কামড় বসায় হিংস্রভাবে গলার মাংসে, শিরা উপশিরা দ্বিখণ্ডিত করে, হাড় পর্যন্ত ভেঙে দেয়...

BanglaBook.org

আরে ছাড় ইয়ার, লাগে তো মাত্তর আধ সেকেন্ড! সুতরাং ওই সময়টুকুতে ব্যথা বলো, বেদনা বলো, যাই মালুম হবে সে তো যৎসামান্যই...

ওফ্, কি ভয়ানক!

৪০.

হয়তো শুনতে অবিশ্বাস্য ঠেকবে তবু সবসময় আমার মন জুড়ে রয়েছে রাজার চিন্তা। ব্যাপারটাকে যতই উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি না কেন বা মাথা ঝাঁকানোকে প্রশ্রয় দিই না কেন, একটা কণ্ঠস্বর যেন ক্রমাগত আমার কানের কাছে বলেই চলেছে

'ঠিক এই শহরে, ঠিক এই সময়ে, এবং এখান থেকে বেশি দূরেও নয়, অন্য এক রাজপ্রাসাদে একজন মানুষ বাস করেন যাঁর প্রত্যেকটি দরজায় দরজায় পাহারাদারের দল। একজন মানুষ যাঁকে সাধারণের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা হয়েছে। ঠিক আমারই মতো। তফাৎ শুধু একটাই—তিনি যতটাই উঁচুতে আমি ঠিক ততটাই নিচে, তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত গৌরব, মহত্ত্ব, আনন্দ ও উল্লাসের আরাধনায় নিয়োজিত। তাঁকে ঘিরে রয়েছে শুধুই ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর সমাদর। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় মাথা নত করতে হয়, উদ্ধত কণ্ঠস্বর শালীন হয় এবং দাম্ভিক প্রতিশ্রুতি বা শপথকেও নতজানু হতে হয়। তাঁর চারপাশে সোনা ও সিল্কের থেকে অন্য কিছু নিকৃষ্ট জিনিসের কথা ভাবাই যায় না। এই মুহূর্তে তিনি হয়তো মন্ত্রীসভার কাজকর্ম পরিচালনা করছেন যেখানে প্রত্যেকেই তাঁর সঙ্গে সহমত। অথবা হয়তো তিনি আগামিকালের শিকারের কথা ভাবছেন অথবা চিন্তা করছেন আজকের সান্ধ্য নাচ গানের আসরের কথা। তাঁর সব ব্যাপারেই একটা কথা নিশ্চিত যে উৎসবেরই হোক বা শিকারেরই হোক সব কিছুরই আরম্ভ নির্ধারিত সময়েই হবে। কারণ অন্যেরা যে তাঁর আনন্দের জন্য সবকিছু বন্দোবস্ত আগেভাগেই করে রাখছে। তবু এই মানুষটিও তো আর সকলেরই মতো রক্ত মাংসেই গড়া। আর ভয়াবহ মঞ্চটাকে ভেঙে চুড়ে তছনছ করে দিতে, কারও জীবন, স্বাধীনতা, ভাগ্য আর পরিবার সবকিছু ফিরিয়ে দিতে তাঁর শুধু চাই এই কলমটা আর একটুকরো কাগজের নিচে তাঁর নামের শুধু সাতটি[১৫] অক্ষর অথবা রাস্তায় তাঁর জুরি গাড়ির সঙ্গে তোমার দু-চাকার এক্কার একবার দেখা হওয়া। তিনি তো মহান, তাই উনি অযথা অপরের অনিষ্ট চিন্তা করবেন এমনটা ভাবাই যায় না!'

৪১.

তাহলে এসো ভয়ংকর ভবিতব্যকে কাছে ডেকে, তার মুখের পানে সোজা তাকিয়ে সাহসের সঙ্গে মৃত্যুর মোকাবিলা করা যাক। এসো মৃত্যুকেই বলি যে সে আমাদের

BanglaBook.org

বোঝাক তার আপন স্বরূপ, এসো শুধাই যে ও কী চায় আমাদের কাছে অথবা ওর যাবতীয় রহস্য উন্মোচন করতে সমাধির গর্ভগৃহে দৃষ্টি মেলে এসো আমরা ওকে প্রতিটি কোণ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি।

আমি বিশ্বাস করি যে, যে মুহূর্তে আমার দুচোখ বন্ধ হয়ে যাবে তখন থেকেই তারা হবে ঈশ্বরীয় উজ্জ্বলতায় পরিপ্লুত আর আলোক রশ্মির পথ ধরে মনের শুরু হবে অনন্ত যাত্রা। আপন আলোয় আকাশ হয়ে থাকবে ভাস্বর, যেখানে ফুটে থাকবে তারাদল, কালো কলঙ্ক চিহ্নের মতো। সাধারণ মানুষের চোখে যেমন দেখা যায় সেইরকম কালো ভেলভেটের ওপর সোনালি চুমকির মতো নয়, তার বদলে ওদের দেখতে লাগবে একটা সোনালি কাপড়ের মধ্যে হাজার হাজার কালো ক্ষতচিহ্নের মতো।

আর যেহেতু আমি আমার পোড়া অদৃষ্টের কথা জানি তাই আকাশকে আমার কুৎসিত ও গভীর এক শূন্যতা মনে হতেই পারে যার দেওয়ালগুলো অন্ধকারে মোড়া, যার মধ্যে দিয়ে অনন্তকাল আমি পড়ে যেতেই থাকবো সেইসব ছায়ামূর্তিদের গা ঘেষে, বিষাদের মধ্যেই যাদের ওঠাবসা।

অথবা আমার গলার ওপর খাঁড়াটা নেমে আসার পর আমি হয়তো আবার জেগে উঠবো কোনো এক কর্দমাক্ত সমভূমিতে। অন্ধকারে হামাগুড়ি দিতে দিতে আমি হয়তো ক্রমাগত ঘুরতে থাকবো, ঘুরতেই থাকবো। যেমন করে একটা মাথা ঘুরতে থাকে। আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলবে একটা উদ্দাম হাওয়া আর আরো অনেক অনেক অনেক ঘুরন্ত মাথার সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে আমার মাথাটাও বনবন করে ঘুরতেই থাকবে। জায়গায় জায়গায় খানাখন্দ পূর্ণ থাকবে একধরনের উষ্ণ, অপরিচিত তরল পদার্থে। সবকিছুই আশেপাশে ওপরে নিচে মনে হবে কালো রঙের। যখন আমার চোখ উপরে তাকাবে তখন সেখানে আলকাতরার মতো কালো আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না যার ভারী স্তরগুলো হঠাৎই ঘাড়ের ওপর নেমে আসবে। আর অনেক দূরে ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেয়ে ফেলবে পরিমণ্ডল যার রঙ অন্ধকারের চেয়েও কালো। রাতের আকাশে ছোট ছোট লাল রঙের ফুলকিগুলো যত কাছে আসতে থাকবে ততই তারা যেন আগুনের পাখিতে রূপান্তরিত হতে থাকবে। এরকমটাই হবে অনন্তের অঙ্গীকার।

হয়তো বা অন্ধকার শীতের রাত্রিগুলোতে কোনো এক নির্দিষ্ট তারিখে লা গ্রীভ-এর সমস্ত মৃতেরা জমায়েত হবে তাদের এই চত্বরে। আমারও এই বিবর্ণ, রক্তাক্ত জমায়েতে গরহাজির থাকা উচিত হবে না। প্রত্যাশা মতোই সেখানে কোনো চাঁদ উঠবে না। ফিসফিসিয়ে কথা বলবে কণ্ঠস্বরগুলো। নোংরা ছাদ আর ভাঙাচোরা প্রবেশদ্বার নিয়ে ওতেল দ্য ভিল-ও সেখানে হাজির থাকবে। আর থাকবে সেই ঘড়ি যার হাতদুটো নিষ্ঠুরভাবে ছুটে চলে শুধু আমাদেরই নিয়তি নির্দেশের জন্য। নরকে ব্যবহৃত একটা গিলোটিন সেই চত্বরে রাখা হবে যার ওপর স্বয়ং শয়তান একজন পৃথিবীর ঘাতকের মুণ্ডুচ্ছেদ করবে। তখন ভোর চারটে। ওই সময়টাই তো তখন

BanglaBook.org

আমাদের মতো ছায়াশরীরদের মজা লোটার জন্যে চত্বরটার আশেপাশে জমায়েত হওয়ার সময়।

এসবই আমি আগেভাগে বুঝতে পেরে বলছি বটে, কিন্তু সত্যিই যদি এইসব নিহত ব্যক্তিরা ফিরে আসে তাহলে তারা কেমন শরীর নিয়ে হাজির হবে? অসম্পূর্ণ ও নষ্ট দেহের কোন অংশটুকু তাদের প্রতিনিধিত্ব করবে? ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহাবশেষ নাকি মুণ্ডুটা—কোনটা তাদের বেশি পছন্দের থাকবে তখনো? কোন অংশটা প্রেত হবে—ওদের ছিন্নভিন্ন ধড় নাকি মুণ্ডু?

হায়! সে কেমন খেলা যা মৃত্যু আমাদের আত্মাকে নিয়ে খেলে? কোন নতুন রূপে সেই আত্মা আবার ফিরে ফিরে আসে? কী সেই জিনিস যা তার থেকে বিযুক্ত হয়ে যায় আর কিই-বা তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়? কোথায় তাদের আবাস? ওই আত্মাদের কেউ কি কোনোদিন রক্ত মাংসের চোখ ধার দেয় যা দিয়ে ওরা পৃথিবীর দিকে তাকাতে তাকাতে বুক ভরে কেঁদে নিতে পারে?

আমার কাছে একজন যাজককে নিয়ে এসো। এমনই এক যাজক যে আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে! এখন সত্যিই আমার একজন জ্ঞানী যাজক প্রয়োজন আর একটা ক্রুশ যাতে আমি শ্রদ্ধার চুমো দিতে পারি!

হা ঈশ্বর! উহ্, তবু অন্য কেউ নয়, এখনো সেই একই যাজক!

BanglaBook.org

৪২.

আমি ওঁকে বললাম আমি ঘুমাতে চাই। বলেই নিজেকে বিছানায় ছুঁড়ে দিলাম।

মাথায় আমার রক্তাধিক্যতা এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে সত্যি কথা বলতে কি বেশ কষ্ট করেই আমি ঘুমাতে পেরেছিলাম। আমার শেষ ঘুমটা ছিল মোটামুটি এরকম।

আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম।

আমি স্বপ্ন দেখলাম যে তখন বেশ রাত। দু-তিন জন বন্ধুকে নিয়ে আমি আমার পড়ার ঘরে। তবে বন্ধুরা যে কে কে ছিল তা বলতে পারবো না।

বাচ্চাটাকে জড়িয়ে আমার স্ত্রী পাশের ঘরে ঘুমাচ্ছিল।

আমি ও আমার বন্ধুরা নীচুস্বরে কথাবার্তা বলছিলাম এবং নিজেদের কথায় নিজেরাই শিউরে শিউরে উঠছিলাম।

হঠাৎই মনে হলো, যেন অন্য কোনো একটা ঘর থেকে একটা আওয়াজ শুনলাম। মৃদু, অদ্ভুত ও অপরিচিত এক আওয়াজ।

আমার বন্ধুরাও আওয়াজটা শুনতে পেয়েছে। আমাদের সকলেরই মনে হয়েছিল যেন খুব আস্তে আস্তে তালা খোলা হচ্ছে অথবা একটা ছিটকিনি।

ওই আওয়াজটার মধ্যে এমন একটা অপার্থিব কিছু ছিল যা আমাদের রক্ত হিম করে দিল। আমরা প্রত্যেকেই ভীষণ ভয় পেলাম। রাতও বেশ গভীর। সুতরাং ভাবলাম বোধহয় চোরই ঢুকেছে।

অতএব ঠিক করলাম যে সরেজমিনে গিয়ে আমরা দেখবো ব্যাপারটা কী! আমি উঠে মোমবাতিটা নিলাম। বন্ধুরা আমাকে একে একে অনুসরণ করে এলো।

প্রথমে আমরা পাশের শোবার ঘরটা ভালো করে দেখলাম। আমার স্ত্রী ওর মেয়েকে নিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। তারপর আমরা ড্রইংরুমে। নাহ্, সেখানেও কেউ নেই। লাল কাপড় মোড়া সোনালি ফ্রেমের মধ্যে থেকে শুধু ছবিগুলোই আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। এবার আমার মনে হলো যে ড্রইংরুম থেকে ডাইনিং রুমে যাবার দরজাটা ঠিক যেমনটি থাকা উচিত তেমনটি নেই।

আমরা ডাইনিং রুমে সাবধানে ঢুকলাম। চারপাশটা ভালো করে দেখলাম সবাই মিলে। অবশ্যই আমি ছিলাম সকলের আগে আগে। সিঁড়িঘরের দরজাটাতে ছিটকিনি তালা সবই ঠিকঠাক দেওয়া ছিল। জানালাগুলোও বন্ধ। কিন্তু যখন আমি স্টোভটার কাছে এগোলাম তখন দেখলাম কাপড় চোপড় রাখার আলমারিটা খোলা আর ওটার একটা পাল্লা দেওয়ালের দিকে ভেতর থেকে যেন টেনে রাখা হয়েছে পেছনে লুকাবার জন্যে।

মনে হলো ব্যাপারটা সন্দেহজনক। সকলে মিলে সিদ্ধান্তে এলাম যে ওটার পেছনে নিশ্চয়ই কেউ লুকিয়ে আছে।

আমি দরজাটা টেনে আলমারিটা বন্ধ করতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। অবাক হয়ে আমি আরো জোরে দরজাটা টানলাম। এবার হঠাৎই পাল্লাটা সামনে চলে এলো। দেখলাম ওটার পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোটখাট চেহারার এক বৃদ্ধা। চুপ করে এক কোণে দাঁড়িয়ে। তার চোখ দুটো বোঁজা, হাতদুটো লটপট করে ঝুলছে। দৃশ্যটার মধ্যে ভয়ংকর একটা ভৌতিক ব্যাপারের মতো ছিল। দৃশ্যটা গায়ের সব লোম ভয়ে খাড়া করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

বৃদ্ধা মহিলাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম—'তুমি এখানে কী করছো?'

ও কোনো জবাব দিল না।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—'কে তুমি?'

তবুও ও কোনো উত্তর দিল না। নড়াচড়া পর্যন্ত করলো না। ওর চোখদুটো যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধই রইলো।

আমার বন্ধুরা বললো বুড়িটা নিশ্চয়ই চোরেদের সাকরেদ যারা আমাদের আসার আওয়াজ শুনে চম্পট দিয়েছে। এটা পালাতে পারেনি বলে এইখানে লুকিয়েছে।

আমি ওকে আবারও প্রশ্ন করলাম। কিন্তু ও চুপ করেই রইলো। না কোনো নড়াচড়া, তাকানো পর্যন্ত না।

আমাদের মধ্যে একজন ওকে একটু ধাক্কা দিতেই ও পড়ে গেল। এমন নিষ্প্রাণভাবে পড়লো যেন একটা কাঠের টুকরো। আমরা ওকে আমাদের পা দিয়ে খোঁচা মেরে দেখলাম। তারপর আমাদের মধ্যে দু'জন ধরাধরি করে ওকে আবার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। তবুও ওর মধ্যে জীবনের কোনো চিহ্ন

BanglaBook.org

বোঝা গেল না। আমরা ওর কানের কাছে চিৎকার করলাম। কিন্তু তবুও ও এত নিশ্চুপ হয়ে রইলো যে মনে হলো ও বোধহয় বদ্ধ কালা।

আমরা কিন্তু এবার সংযম হারিয়ে ফেলতে লাগলাম। আমাদের ভয়ের মধ্যে রাগও এসে বাসা বাঁধতে লাগলো। এক বন্ধু বললো—'বুড়ির থুতনীর নিচে মোমটা নিয়ে গিয়ে একটু রাখো। তারপর দেখো কী হয়।' কথামতো মোমের শিখাটা ওর থুতনীর নিচে নিয়ে গিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতেই ওর একটা চোখ আধখোলা মতো হলো। সে এমন এক অপার্থিব চোখ যার দৃষ্টি শূন্য, জড়, ভয়ানক এবং সেই চোখ তাকালেও মনে হলো যেন কিছুই দেখছে না।

আমি আগুনের শিখাটা সরিয়ে নিয়ে বললাম—'বুড়ি ডাইনী, এইবার কথা বলবে কি? কে তুমি তাড়াতাড়ি বলো!'

উত্তরে সেই চোখ আবার যেন আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে গেল।

বন্ধুরা বললো—'বুড়িটা বড় বাড়াবাড়ি করছে তো? আবার ছেঁকা দাও! আবার! আবার! কথা ওকে বলতেই হবে!'

সুতরাং আবার আমি বুড়িটার থুতনীর নিচে আগুনটা ধরলাম।

এইবার সে তার দুটো চোখই খুব আস্তে আস্তে খুললো। ওর দৃষ্টি এতক্ষণে আমাদের সবাইকে ছুঁয়ে গেল। এরপর তড়িৎগতিতে সে নিচু হয়ে তার বরফের মতো ঠান্ডা ফুঁ দিয়ে মোমটাকে নিভিয়ে দিল। ঠিক সেই সময় নীচের অন্ধকারে আমি অনুভব করলাম তিনটি ভয়ংকর ধারালো দাঁত আমার হাতের মাংসপেশীতে সজোরে বসে যাচ্ছে।

জেগে উঠে দেখলাম যে আমি ঠকঠক করে ভয়ে কাঁপছি। আর আমার সারা দেহ ভিজে একেবারে চপচপে। বরফ ঠান্ডা ঘামে।

আমার সহৃদয় ধর্মযাজক তখন আমার বিছানার পায়ের দিকটায় বসে তাঁর প্রার্থনা গ্রন্থ পড়ছিলেন।

'আমি কি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি'—ওঁকে শুধালাম।

'হ্যাঁ বাবা, তা প্রায় ঘণ্টাখানেক' উনি বললেন।

'আমরা তোমার বাচ্চাটাকে এনেছি। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ও পাশের ঘরেই অপেক্ষা করছে। আমিই ওদের বলে রেখেছিলাম তোমাকে না জাগাতে।'

'তাই নাকি! আমার মেয়ে! আমার মেয়েকে শিগ্‌গির নিয়ে আসুন'—আমি উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

৪৩.

আমার মেয়েটা খুবই ছোট্ট। ওর লাল টুকটুকে গাল, দীঘল দীঘল চোখ, কী বলবো, ও আমার ভীষণ মিষ্টি আর খু-উ-ব-খুউ-ব সুন্দর আদরের মা-মণি।

BanglaBook.org

ও এখন এমন একটা পোশাক পরে আছে যা শুধু সারা পৃথিবীতে ওকেই সবচেয়ে বেশি মানায়। কোলে তুলে নিয়ে দু-হাতে ওকে দোলাতে থাকলাম। ওকে আমার হাঁটুর ওপর বসালাম তারপর অনেক আদর করতে করতে ওর চুলে চুমুর পর চুমু খেতে লাগলাম।

কিন্তু ওর মা কোথায়? সে এলো না কেন? ভাবলাম হয়তো খুবই অসুস্থ বলে ঠাকুরমার সঙ্গে এসেছে।

ও আমার দিকে কিছুটা বিস্ময় নিয়েই তাকালো। যদিও ও আমাকে খুশিমতো আদর করতে ও অজস্র চুমু খেতে দিল তবু কিছুটা শঙ্কিতভাবেই ও প্রায়শই আমাদের কাজের মেয়েটার দিকে তাকাতে থাকলো যে ঘরের এককোণে বসে বসে অঝোর ধারায় শুধু কেঁদেই যাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পরে আমি কথা বলতে পারলাম—'মেরী, ছোট্ট মা আমার।' আমি ওকে আমার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠা বুকের মাঝে সজোরে চেপে ধরলাম।

ও একটু আর্তনাদ করে উঠলো—'স্যার, আমার লাগছে যে।'

'স্যার!' বেচারি মেয়েটা যে আমাকে শেষবার দেখেছে বছরখানেক আগে। ও আমার মুখটা ভুলে গেছে, আমার কথাও, এমনকি আমার গলার স্বরও। তবে কেই-বা আমাকে এইরকম একমুখ দাড়ি গোঁফে, এইরকম নোংরা পোশাকে আর এইরকম বিবর্ণ গায়ের রঙ দেখে চিনতে পারবে? তাহলে কি আমি ওর মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছি? অথচ ওই ছোট্ট মেয়েটাকে ঘিরেই তো আজও আমার যত বাঁচার আকাঙ্ক্ষা! তবু আজ আর আমি আমার মেয়ের 'ড্যাডি' নই। হয়তো ড্যাডি বলে আর আমাকে ডাকাও যায় না। তাহলে কি সেদিনের আরো ছোট্ট সেই শিশুর আদুরে গলার ডাক আজ একটুখানি মাত্র বড় হয়ে যাওয়া মেয়ের কাছে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে গেল?

অথচ ওর কচি গলার 'ড্যাডি' ডাকটা আর মাত্র একবার শোনার জন্যে আমি আমার চল্লিশ বছরের জীবন এক্ষুণি বিসর্জন দিতে পারি। অবশ্য সে জীবন আমি এক্ষুণি হারাতেই তো চলেছি!

'আচ্ছা মেরী মা'—আমি ওর ছোট্ট হাতদুটো নিজের মুঠোয় নিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলাম—'তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো না?'

ও তার সুন্দর চোখদুটো তুলে আমার পানে উত্তরটা ছুঁড়ে দিল—

'কই না তো।'

'ভালো করে তাকিয়ে দেখো তো মা'—আমি আবার বললাম—'এবার নিশ্চয়ই তুমি বলবে না যে তুমি আমাকে চেনো না!'

'ওফ হো'—মেরী তার মিষ্টি গলায় বলে উঠলো—'এবার বুঝেছি, আপনি একজন ভদ্রলোক।'

ওফ্, হায় ভগবান! তোমার এতবড় পৃথিবীতে শুধু এমন একজনকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসা কি চরম বেদনাদায়ক নয় যে তোমার খু-উ-ব কাছে রয়েছে,

BanglaBook.org

তোমার দিকে চেয়ে আছে, তোমার সঙ্গে কথা বলছে, তোমার কথার উত্তর দিচ্ছে, অথচ সে তোমাকে চেনেই না? এই ভয়ংকর দিনে যে ছোট্ট প্রাণটির কাছ থেকে তুমি কিছু সান্ত্বনা খুঁজে নিতে চাইছো এ বিশাল পৃথিবীতে সেই একমাত্র জানে না যে তুমি তারই জন্য মরতে চলেছো!

'মেরী'—আমি ওকে শুধালাম—'তোমার কি ড্যাডি আছে?'

'নিশ্চয়ই স্যার'—শিশুটি বলে উঠলো।

'তাই নাকি?' 'তাহলে সে কোথায়?'

ও চোখ তুলে তাকালো। ওর চোখ দুটোতে বিস্ময় ঠিকরে বেরোচ্ছে।

'সে কি, তুমি তাও জানো না? সে তো কবে মরে গেছে!'

এবার সে ভয়ে চিৎকার করে উঠলো, কারণ, আরেকটু হলেই আমি প্রায় ওকে কোল থেকে ফেলে দিয়েছিলাম আর কি!

'মরে গেছে!' আমি শুধালাম—'মেরী, তুমি কি মরে যাওয়ার মানে জানো?'

'জানি স্যার,' সে উত্তর দিল, 'যে মাটিতেও আছে আবার স্বর্গেও আছে।'

আপন মনেই সে বলে যেতে থাকলো, 'প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় আমি মা'র কোলে বসে ড্যাডির জন্যে প্রার্থনা করি।'

আমি ওর কপালে চুমু খেয়ে বললাম—'মেরী তোমার প্রার্থনাটা আমাকে একটু শোনাও তো দেখি।'

'না স্যার, কক্ষণো না। দিনের বেলায় প্রার্থনা করা যায় না। তুমি সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ি এসো তখনই তুমি আমার প্রার্থনা শুনতে পাবে।'

নাহ্, আর সহ্য হচ্ছে না মনে হতেই ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম—'মেরী আমিই তোমার ড্যাডি।'

'যাহ্'—ও বলে উঠলো।

আমি ছোট্ট করে জুড়ে দিলাম—'তুমি কি আমাকে তোমার ড্যাডি হিসাবে চাও?'

শিশুটি তখন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললো—'আমার ড্যাডিকে খু-উ-ব সুন্দর দেখতে ছিল।'

চোখের পানি আর চুমোয় চুমোয় আমি ওকে ভরিয়ে দিলাম। ও কেঁদে উঠে আমার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার চেষ্টা করেই যাচ্ছিল—'স্যার আপনার দাড়ি দিয়ে আমাকে আঁচড়ে দিচ্ছেন কেন?'

তখন আবার আমি ওকে আমার হাঁটুর ওপর বসালাম। ওর দিকে নরম চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জিজ্ঞেস করলাম—'মেরী, তুমি পড়তে পারো?'

'হ্যাঁ পারি'—সে উত্তর দিল—'আমি খু-উ-ব ভালো পড়তে পারি। মা আমাকে বানানগুলো শিখিয়ে দেয়।'

'ঠিক আছে, তোমার পড়া তাহলে একটু শোনা যাক'—ওর ছোট্ট হাতের মধ্যে দলা পাকানো কাগজটা দেখিয়ে বললাম। ও ওর ছোট্ট সুন্দর মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললো—'তা কেমন করে হবে, আমি তো কেবল রূপকথা পড়তে পারি।'

BanglaBook.org

'তাতে কী হয়েছে। আমার জন্যে একবার চেষ্টা করবে না? নাও শুরু করো তো সোনা।'

এরপর ও তার হাতের কাগজের ভাঁজটা খুলে ওর ছোট্ট ছোট্ট আঙুল অক্ষরগুলোর ওপর বুলিয়ে বুলিয়ে বানান করে করে পড়তে লাগলো।

'দন্তেস-একার-দন্তেন্ন = সেন, ট-একার দন্তেন্নয়-স = টেন্স

সেনটেন্স

আমি ওর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে রাগে, দুঃখে, অভিমানে, বিবমিষায় সেটাকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে দিলাম। মেরী আমারই মৃত্যু পরোয়ানা আমাকেই পড়ে শোনাচ্ছিল। কাজের মেয়েটা এক পেনীর বিনিময়ে ওই কাগজটা কিনেছিল। কিন্তু এক পেনীর চেয়ে বহু বহু গুণ বেশি দাম ওই কাগজটার জন্য আমাকে দিতে হচ্ছে।

আমার তখনকার অনুভূতি, আমার তখনকার মনের অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা একপ্রকার দুঃসাধ্য। আচমকাই আমার এমনতর দুর্ব্যবহারে মেয়েটা এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে আরেকটু হলেই সে প্রায় কেঁদে ফেলতো আর কি। এরপর হঠাৎই ও বলে উঠলো—'আমার কাগজটা ফেরত দাও। আমি ওটা নিয়ে খেলবো।'

আমি কাজের মেয়েটার কোলে ওকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলাম—'যা ওকে নিয়ে চলে যা।'

ধপাস করে আমি আমার চেয়ারটাতে বসে পড়লাম। বড় নিঃসঙ্গ, বড় একা, বড় হতাশভাবে। এই সময়টাই তো ওদের আসার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ছিল। সমস্ত বন্ধন আজ আমার কেটে গেছে। হৃদয়ের অনুভূতির শেষ তন্তুটাও এই মুহূর্তে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো। এইবার ওরা আমাকে নিয়ে যা যা করতে চায় তার জন্যে আমি সম্পূর্ণভাবে তৈরি।

BanglaBook.org

৪৪.

যাজক আমার খুবই দয়ালু এবং আমার কারারক্ষীও তাই। আমি নিশ্চিত যে যখন আমি আমার মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছিলাম তখন ওরা নিশ্চয়ই দু-ফোঁটা চোখের পানি ফেলেছিল।

হ্যাঁ, ওই অধ্যায়ের অবশেষে সমাপ্তি। এবার আমার সাহসকে আর মনকে ইস্পাতের মতো দৃঢ় করতে হবে, কঠিনতর করে তুলতে হবে যাতে ঘাতকের কথা, ঘোড়ার গাড়িটার কথা, জনতার কথা, আর প্লেস দ্য গ্রীভ-এ মৃত্যুর পৈশাচিক দাঁতের মতো যে জিনিসটা আমার জন্যে তৈরি করা হয়েছে সেগুলোর কথা ভাবার সময় আমার ভয় না করে। আসলে ওই ভয়ানক মেশিনটা আজ পর্যন্ত এত মাথাকে ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে যে সেই সব মুণ্ডুগুলো দিয়ে প্লেস দ্য গ্রীভ-এ যাবার পাথুরে রাস্তাটা নরমুণ্ডে বাঁধাই করে দেওয়া যেতো।

আমার চরম পরিণতির জন্য প্রস্তুত হতে, হাতে আর বড়জোর ঘণ্টাখানেক মতোই বোধহয় সময় আছে।

৪৫.

আমি জানি সমস্ত মানুষজন হাসবে, হাততালি দেবে আর হুররে বলে চিৎকার করে উঠবে। তবু এইসব স্বাধীন লোকেরা যারা কোনোদিন কারারক্ষীদের বিষ নজরে পড়েনি, যারা খুব তাড়াহুড়ো করে একটা নরবলি দেখার মজা লুটতে জমায়েত হয়েছে, চত্বরে জমা হওয়া সেই মানুষের সমুদ্রে হয়তো একাধিক ব্যক্তির ভাগ্যও আমার মতোই এই একই রকমভাবে স্থির হয়ে বা পূর্বনির্ধারিত হয়ে আছে। আর আজ হোক, কাল হোক আমার মাথার মতোই ওদের মাথাগুলোও একদিন লাল রঙের একটা বাক্সের মধ্যে গড়াগড়ি খাবে। আজ যারা আমার জন্যে এখানে জমা হচ্ছে কাল ওরা ওদের নিজেদের জন্যই হয়তো এখানে আসবে।

প্লেস দ্য গ্রীভ-এ এইসব ভাগ্যহতদের জন্য কোথাও একটা মৃত্যুর নাম লেখা নির্দিষ্ট জায়গা আছে, আছে একটা চৌম্বক দণ্ড আর একটা ফাঁদ পাতা। ওইগুলো ঘিরে ঘিরেই ওরা ক্রমাগত পাক খেয়ে চলে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলো ওদের সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলে।

৪৬.

আমার ছোট্ট মেরী! ও আবার খেলতে চলে গেছে। ওর গাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে ও হয়তো এই জনতাকে দেখছে। হয়তো এতক্ষণে ও এই 'ভদ্রলোক'টিকে সম্পূর্ণ ভুলেই গেছে। আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম যে আমার হাতে এখনো ততখানি সময় আছে কিনা যার ভেতর ওকে উদ্দেশ্য করে আমি কটা পাতা লিখে যেতে পারি। হয়তো আজ থেকে আরো পনেরো বছর পরে ও সেই পাতাগুলো পড়ে আমার এই আজকের দিনটার জন্য দু'ফোটা চোখের পানি ফেলতে পারে।

হ্যাঁ, আমিই হচ্ছি সেই মানুষ যে একমাত্র আমার গল্প ওকে শোনাতে পারে আর তাকে বোঝাতে পারে যে, যে নাম আমি তার রেখেছিলাম তাতে কেন এত রক্তের দাগ!

৪৭.

আমার গল্প

প্রকাশকের টিপ্পনী এই পাতাগুলো যেগুলো এই গল্পের সঙ্গে জোড়া হয়েছে সেগুলো আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বোধহয় সেগুলো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মানুষটি

BanglaBook.org

সময়ই পায়নি লিখে যাওয়ার। হয়তো এই চিন্তাগুলো তার মনে দেরী করেই এসেছিল।

৪৮.

ওতেল দ্য ভিল-এর একটা ঘর থেকে

ওতেল দ্য ভিল থেকে... ...! হ্যাঁ অবশেষে এইখানে এলাম। অবশেষে ভয়াবহ এক যাত্রার সমাপ্তি। ঠিক নিচেই চত্বরটা। আর আমার জানলার নীচেই হত্যাপাগল দর্শকেরা দল বেঁধে দাঁড়ায়, অপেক্ষা করে আর কুকুরের মতো চিৎকার করে। যতই আমি আমার অস্থিমজ্জাকে শক্ত করার, নিজেকে বশে রাখার চেষ্টা করি না কেন, অনুভব করছিলাম যে নিদারুণ ভয়ে, হতাশায় আমার বুকটা বাঁশপাতার মতো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। বিশেষ করে যখনই আমার লক্ষ পড়ে যাচ্ছিল মাথার সমুদ্র ছাড়িয়ে বাঁধের ওপর দুটো ল্যাম্পপোস্টের মাঝখানে উঁচু জায়গাটায় বসানো দুটো লাল রঙের থাম ও তার ওপরে একটা কালো ইস্পাতের ত্রিভূজের ওপর। বলতে দ্বিধা নেই বেদম ভয়ে আমার বুক, আমার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আর্জি জানিয়েছিলাম যে কয়েকটা শেষ কথা আমি বলে যেতে চাই। সুতরাং আমাকে এখানে এনে ওরা একজন এ্যাটর্নী আনতে ছুটেছিল। আমি এখন সেই ভদ্রলোকটির জন্যই অপেক্ষা করছি। এভাবেই আমি আরো কিছুটা সময় চুরি করতে পেরেছি মৃত্যুকে বিলম্বিত করার জন্য।

কিন্তু এখন আমি কোথায়?

ঘড়িতে তিনটি বাজতেই ওরা এসে বললো, সময় হয়ে গেছে। তা শুনে আমি এমনভাবে কেঁপে উঠলাম যেন মনে হলো যে আমার মনটা গত ছ'ঘণ্টা, ছ'সপ্তাহ, ছ'মাস ধরে অন্য হাজার ভাবনার মাঝে হারিয়ে ছিল। কারণ ব্যাপারটা আমার কাছে এতটাই অভাবনীয়, এবং এতটাই অকল্পনীয়!

ওরা আমাকে করিডর দিয়ে নিয়ে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামালো। তারপর দুটো দরজার মধ্যে অবস্থিত একটা ছোট্ট, অন্ধকার মাটির নিচের ঘরে বসিয়ে রাখলো। এই ঘরটাতে বৃষ্টিভেজা, কুয়াশা ছেঁড়া দিনের আবছা আলো ঢুকতে পারে না বললেই চলে। ঘরটার মাঝখানে একটা চেয়ার রাখা। ওরা আমাকে ওখানে বসতে বললো। আমি বসলাম।

কয়েকটা লোক দরজায় ও দেওয়ালের ধার ঘেষে দাঁড়িয়ে ছিল। যেমন একজন যাজক, কারারক্ষীরা, এবং ওরা ছাড়াও আরো জনা তিনেক।

প্রথম লোকটা সবচেয়ে লম্বা ও বয়স্ক। দেখতেও বেশ বলশালী। মুখটা টকটকে লাল। লোকটা একটা ফ্রককোট ও তিনটি শিংওয়ালা একটা মলিন টুপি পরে ছিল। মনে হলো ওই লোকটাই নাটের গুরু।

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছি। ওই লোকটাই হচ্ছে ঘাতক। গিলোটিনের প্রধান চালক। আর বাকি দু'জন হলো ওই লোকটার সাহায্যকারী বিশেষ।

BanglaBook.org

সবে আমি চেয়ারটায় বসেছি কি বসিনি, ওই লোকদুটো বেড়ালের মতো ক্ষিপ্রতায় পেছন থেকে এসে আমার শরীরটার দখল নিয়ে নিল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি আমার চুলের ভেতর ঠান্ডা ইস্পাতের স্পর্শ অনুভব করতে থাকলাম। কাঁচির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দও আমার কানে যেতে লাগলো।

অতি অযত্নে কাটা চুলের রাশগুলো আমার কাঁধের ওপর পড়তে থাকলো। আর তিনটি শিংওয়ালা টুপি পরা লোকটা তার বিশাল হাতের থাবা দিয়ে সেগুলোকে ঝেড়ে ফেলতে লাগলো।

আশেপাশে যারা আমাকে ঘিরে ছিল তারা খুব নিচুস্বরে কথা বলছিল। ঝড় উঠলে পাতায় পাতায় যেমন একটা আওয়াজ হয় তেমনি আওয়াজ বাইরে থেকে ভেসে আসছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম ওটা বোধহয় নদীস্রোতের শব্দ। কিন্তু যখন আওয়াজটা হাসির আওয়াজে রূপান্তরিত হলো তখন বুঝলাম যে ওটা জনতার আওয়াজ।

জানালার কাছে বসা এক তরুণ, যে তার নোটবইয়ে পেন্সিল দিয়ে কিছু লিখছিল, সে একজন কারারক্ষীকে জিজ্ঞেস করলো যে এই কাজটার নাম কী?

অন্য এক কারারক্ষীর চটজলদি জবাব—'দণ্ডিতের প্রসাধন।'

জানতে পারলাম যে এইসব বিবরণী আগামীকাল খবরের কাগজে ছাপা হবে।

এরপর অকস্মাৎই একজন সহকারী আমার জ্যাকেটটা খুলে নিতেই অন্য আরেকজন আমার হাতদুটো, যেগুলো আমার দু'পাশে লটপট করে ঝুলছিল সেগুলো পিছমোড়া করে ধরলো। বুঝতে পারলাম গিঁটমারা একটা দড়ি আমার কবজিদুটোকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে আর আমার কবজিদুটো ক্রমাগতই কাছাকাছি এসে যাচ্ছে একে অপরের। ইতিমধ্যে আরো একজন আমার মাফলারটা খুলছিল। আগে আমি যে মানুষটা ছিলাম তার সাক্ষী বহন করছিল একমাত্র আমার দামি শার্টটা আর সেটা দেখেই হয়তো-বা ওই লোকটি একটু ইতস্তত করছিল। কিন্তু ওইটুকুই। পরক্ষণেই লোকটা আমার জামার কলারটা কাটা শুরু করলো।

আমাকে গিলোটিনের নিচে শোয়ানোর আগে যখন এইসব রক্ত জমানো ভয়াবহ সাবধানতা অবলম্বন করা হচ্ছিল এবং একটা ঠান্ডা ইস্পাত আমার ঘাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল সেই সময় এক বলির পশুর মতো ভয়ে আমার কনুইগুলো ঠিকরে উঠে মুক্তি পেতে চাইলো আর আমার গলা দিয়ে একটা জান্তব আওয়াজ বের হয়ে আসতেই কেঁপে উঠলো ঘাতকের সবল হাতও।

'দুঃখিত, স্যার'—সে বলে উঠলো—'আমি কি আপনাকে কষ্ট দিয়ে ফেললাম?'

এইসব ঘাতকেরা ভীষণ রকম ভদ্র। বাইরে যদিও তখন জনসমুদ্রের উত্তাল গর্জনে আকাশ বাতাস মথিত।

ব্রণভর্তি মুখের বলশালী লোকটা ভিনিগারে ভেজানো একটা রুমাল আমাকে শুঁকতে দিল।

BanglaBook.org

আমি যত জোরে পারলাম চিৎকার করে বললাম—'তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি ওটা চাই না। আমি বেশ ভালো আছি।'

এরপর ওদের ভেতর একজন নিচু হয়ে একটা সরু দড়ি দিয়ে আমার পা দুটোকে এমন দূরত্ব বজায় রেখে বাঁধলো যাতে ছোট ছোট পা ফেলে যেতে আমার কোনোরকম অসুবিধা না হয়। পায়ের দড়িটা তারপর আমার হাতে বাঁধা দড়িটার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো।

তারপর সেই বলশালী লোকটা আমার জ্যাকেটটা আমার কাঁধের ওপর বিছিয়ে দিয়ে সেটার হাতদুটো আমার থুতনির নিচে গিঁট দিয়ে দিল। ওদের কর্মকাণ্ডের এই অংশটুকু আপাতত শেষ।

এবার ক্রুশটা হাতে নিয়ে ফাদার উঠে এলেন—'বাবা, এখানে এসো।'

ঘাতকের সহকারীরা আমার বগলের নিচে হাত দিয়ে আমাকে তুলে ধরলো। আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলাম। এমন বেসামাল ছিল আমার হাঁটার ধরন যে মনে হচ্ছিল আমার বুঝি প্রত্যেকটা পায়ে দুটো করে হাঁটু লাগানো আছে।

ঠিক তক্ষুণি বাইরের দরজাটা আওয়াজ করে সবটা খুলে গেল। একটা উন্মাদ কোলাহল, ঠান্ডা বাতাস, আর সাদা আলো, অন্ধকার ভেদ করে ছুটে এসে আমাকে ভাসিয়ে দিতে চাইলো। আমি অন্ধকার দরজার পেছন দিক থেকে বাইরের সবটুকু বৃষ্টিভেজা দৃশ্য এক ঝলকে দেখে নিতে চাইলাম। একজন আরেক জনের প্রায় ঘাড়ে উঠে পড়া, পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকা হাজার হাজার দর্শকের মাথা সিঁড়ির নিচ থেকে শুরু হয়ে চলে গেছিল প্যালাইস পর্যন্ত। আমার ডানদিকে রাস্তায় একদল পুলিশের ঘোড়া যাদের সামনের পায়ের ক্ষুর ও বুকগুলোই শুধু দেখা যাচ্ছিল নিচু প্রবেশ পথ থেকে। তার ঠিক উল্টো দিকে এক দঙ্গল সেনা যুদ্ধের ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে। বাঁ দিকে একটা ঘোড়ার গাড়ির পেছন দিকটা ও তার গায়ে লাগানো একটা কাঠের সিঁড়ি ঢালুভাবে ঠেস দেওয়া রয়েছে দেখা যাচ্ছিল। সে এক রক্ত হিম করা দৃশ্য যা জেলখানার দরজার ফ্রেমে নিখুঁতভাবে আটকানো ছিল।

ঠিক এই মুহূর্তটার মোকাবিলা করবার জন্যেই আমি আমার সবটুকু সাহস ফিরে পেতে চেয়েছিলাম। আমি তিন পা এগিয়ে গিয়ে গেট হাউসের দরজার চৌকাঠে পা রাখলাম।

'ঐ তো লোকটা! ঐ তো লোকটা!' উত্তাল জনসমুদ্র যেন গর্জন করে উঠলো। 'ঐ তো ও আসছে! ব্যস্ এইবার!'

যারা আমার কাছাকাছি ছিল তারা হাততালি দিয়ে উঠলো। যতই লোকে তাঁকে ভালোবাসুক না কেন, আমি নিশ্চিত যে রাজামশাই কিন্তু তাঁর প্রজাদের এই নির্মম আনন্দলাভে মোটেই উৎসাহ দিতেন না।

গাড়িটা ছিল একটা অত্যন্ত সাধারণ, হাড় জিরজিরে ঘোড়ায় টানা আর সেটার চালক একটা লাল এমব্রয়ডারি করা নীল রঙের কুর্তা পড়েছিল। বিসেথ্রে ও তার আশেপাশে বাগানের মালীরা যেমনটা গায়ে দেয় আর কি!

BanglaBook.org

তিনটে শিংওয়ালা টুপি পড়া বলিষ্ট লোকটা প্রথমে উঠলো।

'সুপ্রভাত মঁসিয়ে স্যামসন'—যে বাচ্চাগুলো রেলিং ধরে ঝুলছিল তারা কলকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো।

এরপর একজন সহকারী উঠতে বাচ্চাগুলো আরো একবার চিৎকার করে উঠলো—থ্রি চিয়ার্স ফর মার্দি!

ওরা দুজনেই সামনের সিটে বসল।

এবার আমার পালা। যেন ব্যাপারটা কিছুই না এমন ভাব দেখিয়ে আমি গাড়িতে উঠে বসাটা ম্যানেজ করলাম।

'ওফ, লোকটার সাহস আছে বটে!' পুলিশদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলা বলে উঠলেন।

ওনার এই ভয়ংকর প্রশস্তিটা আমাকে সাহস জোগাল খানিকটা। ফাদার আমার পাশে এসে বসলেন। আমাকে বসানো হয়েছিল পিছনের সিটে। ঘোড়াটার গতিপথের ঠিক উলটো দিকে। ওদের এই অতি নিঁখুত পূর্বপরিকল্পিত চালাকির কথাটা ভেবে আমি আরও একবার ভয়ে শিউরে উঠলাম।

ওফ, কি মানবিক ওদের ব্যবহার!

আমি আমার চারপাশে তাকাবার চেষ্টা করে দেখলাম সামনে পিছনে পুলিশে পুলিশে ছয়লাব। ওদের, পিছনে মানুষের স্রোত, শুধু মানুষ, মানুষ এবং আরও মানুষ। অগণিত, অসংখ্য। গোটা জায়গাটা যেন মাথার সমুদ্র।

এক স্কোয়াড মাউন্টেড পুলিশ প্যালাইস-এর প্রবেশ দ্বারে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ওদের অফিসার কি একটা আদেশ দিতেই ঘোড়ার গাড়িটা ও সেটার রক্ষীবাহিনী চলতে শুরু করল এমনভাবে যেন উন্মত্ত জনতাই ওদের সামনের দিকে ঠেলে গড়িয়ে দিলো।

গেট পেরিয়ে আমরা বাইরে এলাম। গাড়িটা যখন পঁ অ সঁজ-ব্রিজটার দিকে বাঁক নিলো তখন স্কোয়ার-এর শুরু থেকে আমার জন্য তৈরি হত্যামঞ্চটার শেষ কাঠের টুকরোটা পর্যন্ত সেই জনসমুদ্রের উল্লাসে, চিৎকারে থরথর করে কেঁপে উঠল। তারপর ব্রিজের ধারে ও নদীর তীরে জমা হওয়া জনতাও যখন সেই চিৎকারে সামিল হলো তখন মনে হতে লাগল বুঝিবা ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। আর সেইখানে পদাতিক বাহিনী ও মাউন্টেড পুলিশ একসঙ্গে মিশে গেল।

'সাবাশ ভাই সাবাশ'– আমার উদ্দেশ্যে হাজার হাজার ঠোঁট একসঙ্গে এমন চেঁচিয়ে উঠল যেন মনে হলো আমি একজন শাহজাদা।

আমি ভীষণ করুণভাবে হেসে উঠে ফাদারের দিকে তাকিয়ে বললাম– 'ওদের সাবাশ মানে তো আমার এই মাথাটা!'

আমরা খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছিলাম।

কোয়া অ ফ্লর-এর বাতাস তখন ফুলের গন্ধে ম ম। কারণ দিনটা ছিল ফুল-বাজারের। ফুলওয়ালী মেয়েগুলো ওদের ফুলের 'বোকে' তৈরির কাজ ফেলে ছুটে ছুটে এসে আমাকে দেখে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

ঠিক উল্টোদিকে একটা ছোট্ট রাস্তা। প্যালাইস-এর এক কোণে অবস্থিত চৌকো টাওয়ারটা থেকে সিধে চলে গেছে। ওই রাস্তাটার পানশালাগুলোর প্রতিটি বারান্দা মানুষে মানুষে ছয়লাপ। সমস্ত ঘটনাক্রম ওরা এত পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছে যে দূর থেকেও ওদের হাবভাবে মনে হচ্ছে ওরা খুবই আনন্দিত। ওদের বেশিরভাগই অবশ্য মেয়ে মানুষ। বাড়িওয়ালারা আজকের দিনটা নিজের নিজের বাড়িগুলোকে চুটিয়ে ব্যবসার কাজে খাটাচ্ছে।

চেয়ার, টেবিল, মই, মাচা, ওয়াগন—ভাড়া খাটার ব্যাপারে কোনোটাই একপাও পিছু হটতে রাজি নয়। প্রতিটি অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক স্থানই লোকে লোকারণ্য। মানুষের রক্তের দালালেরা ক্রমাগত চিৎকার করছে—'নিজের নিজের জায়গায় চলে যান।'

এই সমস্ত উপস্থিত মানুষজনের ওপর আমার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল চিৎকার করে ওদের উদ্দেশ্যে বলি—'কই হে, তোমাদের মধ্যে কেউ একজন এসে আমার জায়গাটা দখল কর তো দেখি।'

ইতিমধ্যে গাড়িটা আবার চলতে শুরু করেছিল। যতই ওটা এগিয়ে যাচ্ছিল, অন্যমস্কভাবে হলেও আমার নজর পড়ে যাচ্ছিল তাদের ওপর যে লোকগুলো আমাদের পেছনে পড়ে যাচ্ছে। আমাকে আরেকটু ভালো করে দেখার জন্য ওরা আবার ছুটাছুটি করে আমার যাত্রাপথের সামনের দিকে আসতে এবং একটু জায়গা পাওয়ার জন্য গুঁতোগুঁতিতে ওদের এতটুকু খামতি ছিল না।

পঁ অ সঁজ-এর দিকে আমাদের গাড়িটা বাঁক নিতেই কি জানি কেন আমার ডানদিকের পেছনটায় নজর চলে গেল। দেখতে পেলাম নদীর অপর পারের ঘরবাড়িগুলোকে ছাড়িয়ে বিশাল একটা কালো টাওয়ার দাঁড়িয়ে। যার ওপর অনেক পাথর খোদাই মূর্তি আর দু'পাশে দুটো পাথরের দৈত্য দাঁড়িয়ে। কিছু একটা ভেবেই হয়তো আমি ফাদারকে জিজ্ঞেস করলাম—'ওই টাওয়ারটার নাম কী?'

বলিষ্ঠ ঘাতকের মুখ থেকে চটজলদি উত্তর ভেসে এলো—'সঁ জ্যাক লা বুশের'।

চারপাশে ঘন কুয়াশা ও সাদা ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি বাতাসে নেচে নেচে বেড়াচ্ছিল মাকড়সার জালের মতো। তবু এসব সত্ত্বেও আমার চারপাশে যা ঘটে চলছিল তার কোনোকিছুই আমার নজর এড়িয়ে যাচ্ছিল না। এইসব দৃশ্য বা ঘটনার প্রত্যেকটির বর্ণনা যেন এক একটি নারকীয় যন্ত্রণার মূর্ত প্রতীক। শব্দেরা কবে আর অনুভূতিকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে!

পঁ অ সঁজ-এর মাঝামাঝি জায়গায় এত লোকের গাদাগাদি যে আমাদের গাড়িটাকে একটা পা এগোতে গেলেও বেশ কষ্ট করেই এগোতে হচ্ছিল। বেদম একটা ভয় হঠাৎই যেন আমাকে আরো জোরে সাঁড়াশীর মতো চেপে ধরলো। তবু আমার হাবভাবে কোনো দুর্বলতাই দেখা গেল না! আমি আমার সমস্ত সত্তা, অনুভূতি সবকিছুকেই বিসর্জন দিলাম। এবার ফাদার ছাড়া অন্য সব কিছুর কাছে, সবার কাছে অন্ধ ও কালা হয়ে গেলাম। অবশ্য ফাদারের কথাগুলোও আমি ওই বিশাল জনসমুদ্রের গর্জনে ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছিলাম না বললেই ভালো হয়।

BanglaBook.org

আমি ক্রুশটিকে নিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে একটি চুমু খেলাম আর বললাম—'হে ঈশ্বর, আমার ওপর করুণা করো!' এরপর ঈশ্বরের ভাবনাতেই আমি নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চাইলাম।

কিন্তু এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় প্রতিবার গাড়ির প্রবল ঝাঁকুনি আমাকে ঐশ্বরিক ভাবনা থেকে ক্রমাগতই দূরে সরিয়ে দিতে লাগলো। এবার অকস্মাৎই আমার মজ্জায় মজ্জায় প্রবল শীত অনুভব করতে লাগলাম। বৃষ্টিতে আমার সব জামাকাপড় ভিজে চপচপে হয়ে গেছে। ছোট্ট ছোট্ট করে ছাঁটা চুলের নিচে আমার মাথার চামড়াও ভিজে একসা।

ফাদার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—'বাবা, তুমি কি শীতের জন্যে কাঁপছো?'

আমি উত্তর দিলাম—'হ্যাঁ।'

হায়! আমার কেঁপে কেঁপে ওঠাটা সবটাই যদি শীতের জন্য হতো!

ব্রিজটা ছাড়িয়ে আমরা যখন আবার একটা বাঁক নিলাম তখন শুনতে পেলাম এক মহিলার ক্ষেদোক্তি—'আহারে, এত কম বয়সে!'

তারপর আমরা সেই ভয়ংকর বাঁধের পাশ দিয়ে চলতে থাকলাম। এই সময়টা থেকে আমি আর কিছু দেখতে বা শুনতে পাচ্ছিলাম না। যদিও সেখানে হাজার কণ্ঠস্বর ছিল, জানলায় জানলায় ছিল হাজার হাজার মানুষের মাথা। শুধু জানলায় নয়, ছিল দরজায় দরজায়, দোকানের সামনে, ল্যাম্পপোস্টের গায়ে। এই সমস্ত নির্মম, রক্তপিপাসু দর্শকের দল, এই জনসমুদ্র, এরা প্রত্যেকেই আমাকে চেনে। শুধু আমিই ওদের একজনকেও চিনি না। এই পাথর বাঁধানো রাস্তা ও দেওয়াল যেন মানুষের মুখ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। আমি মাতালের মতো অনুভূতিশূন্য ও জ্ঞানহীন হয়ে পড়ছি ক্রমশই। এই যে এত লোকের দৃষ্টির ভার যদি একজন অসহায় মানুষকে নিরন্তর বিদ্ধ করে চলে সেটাই তো যথেষ্ট পরিমাণে অসহনীয়। আমার জায়গায় বসে আমি এপাশ ওপাশ দুলতে থাকলাম। ফাদার বা তাঁর পবিত্র ক্রুশটির কথাও বেমালুম ভুলে বসেছিলাম।

আমার চারপাশে এত চেঁচামেচির মধ্যে আমি বুঝতে পারছিলাম না কোনটা আনন্দের অথবা কোনটা দুঃখের, কোনটা হাসির অথবা কোনটা পরদুঃখকাতরতার, কোনটা কথা অথবা কোনটা শুধুই শোরগোল। এই সবের মিলিত কোলাহল যেন আমার মাথার মধ্যে তোপের মতো ফেটে গিয়ে একটা ভোঁতা ধাতব প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

যান্ত্রিকভাবে আমার চোখ দোকানের হোর্ডিংগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। একবার, শুধু একবারই কি এক বিকৃত কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই বুঝি বা আমার মুখ ঘুরিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল যে আমি কোথায় যাচ্ছি আমার প্রজ্ঞার শেষ দাম্ভিক কাজ। কিন্তু আমার শরীর তো সে কথা শোনেনি। আর পক্ষাঘাতগ্রস্ত গলা দিয়েও কোনো আওয়াজ বের হয়নি।

আমার বাঁদিকে নদীর ওপর দিয়ে নটরডেম টাওয়ারের শুধু একটা দিকের দৃশ্যই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। এই জায়গা থেকে দেখলে একটা দিকই শুধু দেখা যায়।

BanglaBook.org

অন্য দিকটা লুকানো থাকে। অর্থাৎ সেই দিকটা যেদিকে প্ল্যাগপোল আছে সেই দিকটাই দৃশ্যমান। ওখানে এখন বহু লোকের ভিড়, কারণ ওখান থেকে সবকিছু খুব ভালো করে দেখা যাচ্ছে।

আমার গাড়িটার এগিয়ে চলার তালে তালে তাল মিলিয়ে দোকানগুলো ধীরে ধীরে পিছন দিকে হারিয়ে যেতে থাকলো। সঙ্গে হারিয়ে যেতে থাকলো দোকানগুলোর গায়ের লেখা, ছবি, রং। জনতা হেসে উঠে কাদার থেকে পা তুলে সজোরে আবার কাদার মধ্যেই ওদের পা ডোবালো। আর আমি নিজেকে ওদের স্বপ্নের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে দিলাম।

অকস্মাৎ আমার চোখের সামনে দিয়ে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়া দোকানগুলো একসময় একটা চত্বরের কোণায় এসে শেষ হয়ে গেল। এবার জনতার চিৎকার ও উল্লাস যেন আরো বেহিসাবী, আরো উত্তেজিত মনে হতে লাগলো। গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যেতেই আমি আরেকটু হলেই প্রায় হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলাম আর কি! ফাদার আমাকে কোনোমতে ধরে ফেলে মৃদুস্বরে বললেন—'সাহস রাখো।' এরপর ওরা একটা মই এনে গাড়িটার পেছনে লাগিয়ে দিতে উনি আমায় হাত ধরে নামিয়ে দিলেন। আমি এক পা এগোলাম। তারপর আর এক পা এগোতে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার রক্ত ভয়ে হিম হয়ে গেল। আমি যেন জমে বরফ হয়ে গেলাম। দুটো ল্যাম্প পোস্টের মাঝে বাঁধের ওপর সে এক দুঃস্বপ্নের মতো মেশিন।

কিন্তু নাহ্! আমি কোনো স্বপ্ন দেখছিলাম না!

তাই নিদারুণ মানসিক আঘাতে আমার চলার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল।

'আমার একটা শেষ কথা বলার আছে'—এক অতি দুর্বল পঙ্গু, অতি অসহায়, অশক্তের মতো আমি হাউ হাউ করে ভয়ে কেঁদে উঠলাম।

সুতরাং আমাকে এইখানে আনা হলো।

আমি আমার শেষ ইচ্ছা নথিভুক্ত করাতে চাইলাম। এবার ওরা আমার হাতদুটো খুলে দিল। কিন্তু দড়িটা প্রস্তুত হয়েই আছে—আমাকে আবার বেঁধে ফেলার জন্য। আর তার পরের অংশটা আমার জন্য নিচে অপেক্ষায়।

৪৯.

একজন জজ. পুলিশ সুপার অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের মতো ভদ্রলোক ঘরে ঢুকতে আমি হাঁটু গেড়ে বসে দু-হাত জোর করে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। একটা ভয় ধরানো মুচকি হাসি হেসে তিনি বললেন—'এটা ছাড়া অন্যকিছু যদি বলার না থাকে তাহলে...'

'ক্ষমা করে দিন! ক্ষমা করে দিন!' আমি বলতেই থাকলাম—'অন্যথায় অনুগ্রহ করে আমাকে আর পাঁচটা মিনিট সময় দিন।'

BanglaBook.org

কে বলতে পারে যে সেই খবরটা এই মুহূর্তে ছুটে আসছে না আর নয়ই বা কেন? আমার এই বয়সে এমন করে মৃত্যুবরণ করাটা এত নিদারুণ! শেষ মুহূর্তে ক্ষমার কাহিনী তো কারোরই অজানা নয়! এবং আমি ছাড়া স্যার, ওই রকম নাটকীয়ভাবে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতা আর কারই বা থাকতে পারে বলুন?'

হতচ্ছাড়া জল্লাদটা মরে না কেন! লোকটা উঠে এসে জজ সাহেবকে বললো কাজটা কিন্তু ঠিক সময়ে শেষ করাটাই বাঞ্ছনীয়। আর শেষ করার দায়িত্ব যেহেতু তারই এবং যেহেতু সময় প্রায় হয়ে এসেছে, আর তাছাড়া যেহেতু ক্রমাগত বৃষ্টিতে তার যন্ত্রপাতিতে আবার মরচে পড়ার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, সুতরাং...

ঈশ্বরের দোহাই! আর একটা মিনিট সবুর করো। তার মধ্যেই আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত ক্ষমার আদেশটা এসে পড়বেই! তখন তাহলে আমি কী করবো? তাহলে আমি বাচ্চা ছেলের মতো লাফাবো, লাথি ছুঁড়বো, চিৎকার করবো! আমি কামড়েও দিতে পারি সবাইকে!

জজ সাহেব এবং জল্লাদ দু'জনেই চলে গেল। এখন আমি একা অবশ্য যদি দু'জন রক্ষীর মাঝখানে থাকাটাকে একা থাকা বলে!

ওইসব রক্তপিপাসু জনতা কেন এখনো অমন করে হায়েনার মতো চিৎকার করেই চলেছে? ওরা হয়তো বিশ্বাসই করতে পারছে না যে আমি ওদের প্রতিহিংসার হাত থেকে বেঁচে যেতে পারি। আহ্, যদি সেরকমটা সত্যিই হয় তাহলে? যদি আমাকে নিঃশর্তে, সসম্মানে মুক্তি দেওয়ার আদেশ... আমাকে অবশ্যই মুক্তি দেওয়া হবে!

নাছোড়বান্দা, নচ্ছার চাকরের দল! ওই ওরা আবার আসছে। একটা একটা করে সিঁড়ি বেয়ে...

এখন ভোর চারটে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

টীকা

---

[১] আলবাক -কে গিলোটিনের নিচে হত্যা করা হয়েছিল ১০ সেপ্টেম্বর ১৮২৭ সালে। যদিও হুগো তাঁর এই 'এক দণ্ডিতের শেষ দিন' বইটি লেখা তারও বছরখানেক পরই শুরু করেছিলেন বলে মনে হয়।

[২] Cesare Bonesana (১৭৩৮-৯৪) ছিলেন Beccaria-র Marquis. তিনি ছিলেন একজন ইতালীয়ান অপরাধবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং আইনজ্ঞ। 'অপরাধ ও শাস্তি'র ওপর লেখা তাঁর প্রবন্ধ (১৭৬৬) মৃত্যুদণ্ড ও অপরাধীদের ওপর অমানবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল।

[৩] লোকগুলো ছিল যথাক্রমে Polignac, Peyronnet, Chantelaure ও Guernon-Ramville এবং Charles-x ছিলেন ২৫ জুলাই ১৮৩০ সালে Ordinance জারির জন্য দায়ী যা পরবর্তী তিনদিনের জুলাই বিপ্লবের অন্যতম কারণ।

[৪] Troy-এর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় প্রথম পুড়ে যাওয়া সুন্দর বাড়িগুলোর মধ্যে Ucalegon-এর বাড়িটাও ছিল (Virgin, Acneid, II, 311-12)।

[৫] এটা নির্দেশ করে ১৬২৬ সালে Henri de Talleyrand-এর মাথা নিষ্ঠুরভাবে কেটে ফেলার ঘটনা, যিনি ছিলেন Louis XII-এর এক প্রিয়জন।

[৬] Farinacious ছিলেন (ষোড়শ শতকের) সন্ধিতে পরান্মুখ একজন রোমান আইনজ্ঞ।

[৭] Themis হলেন গ্রিকদের বিচারের দেবী; Father de l' Ancre সতেরোশ শতাব্দীর ডাকিনী বিদ্যার ওপর বই লিখেছিলেন; Loisel ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর একজন ফরাসি আইনজ্ঞ; Oppêde ছিলেন ষোড়শ শতকে Parliament of Aix-এর President; Machault (d. ১৭৫০) ছিলেন এক সহকারী আইনজীবি এবং Royal Police-এর কুখ্যাত Lieutenant.

[৮] গ্রিক পুরাণে বর্ণিত Aphrodite, Galatea-র প্রস্তর মূর্তিতে যিনি Pygmalion নামক ভাস্করের প্রার্থনার উত্তরে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন।

[৯] Papovine-কে ১৮২৫ সালে হত্যা করা হয়েছিল; Dautun-এর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল ১৮১৫ সালে; Poulain-কে কেটে ফেলা হয়েছিল ১৮১৭ সালে; আর Castaing-কে গিলোটিনের নিচে শুতে হয়েছিল ১৮২৩ সালে : হুগো ১৮২৫ সালে, Jean Martin-এর হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যদিও '১৮২১' সালের উল্লেখ ১৮২০ সালের Pierre-Louis Martin-এর হত্যাকাণ্ডও হতে পারে।

[১০] ১৮২৭ সালে Garde Nationale-কে Charles-X বাতিল করে দিয়েছিলেন। তেরশো শতাব্দী থেকে এই বাহিনীর অস্তিত্ব ছিল। যদিও ১৮৩০ সালে আবার এই বাহিনী নতুন করে তৈরি করা হয়।

[১১] মুক্তিপ্রাপ্ত আসামীদের দেওয়া হতো এক ধরনের হলুদ পাসপোর্ট, বন্দিদের তিনটি অক্ষর ছিল যথাক্রমে 'T' তারপর 'TP' যা নির্দেশ করতো অপরাধীদের দ্বিতীয় অপরাধ; 'Greencaps' নির্দেশ করতো সবুজ টুপি পরা সেইসব বন্দিদের যারা ১০ থেকে ২০ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতো; সাধারণত অপরাধীদের লাল রংয়ের পোশাকই দেওয়া হতো।

[১২] 'গিলোটিন'-এর নামকরণ Doctor Guillotine-এর নামানুসারেই হয়েছিল। তিনিই এই যন্ত্রদানবটির প্রতিভূ। হয়তো-বা আবিষ্কারকও।

[১৩] Hugo-র সঙ্গে Marquise de Monte-Hermoso-র কন্যা Pepita-র আলাপ ১৮১১ সালে মাদ্রিদে। Pepita-র বয়স তখন ছিল ১৪ থেকে ১৬-র মধ্যে আর হুগো-র তখন ন'বছর মাত্র।

[১৪] ইতালীয়ান প্রকৃতিবিদ ও শারীর-স্থান-বিদ্যায় পারদর্শী Lazzaro Spallanzani (১৭২৯-৯৯) তিনখণ্ডে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশ করেছিলেন।

[১৫] সাত অক্ষরের নাম নির্দেশ করে Charles-X-কে যিনি ১৮২৪ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।